মৃগয়া

উৎসর্গ

মুঙ্গের কলেজের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সরকার এম. এ.

করকমলেষু

কালীবাবু,

আশা করি আপনার মনে আছে, 'মৃগয়া' লিখিবার বীজ আপনিই আমার মনে একদা বপন করিয়াছিলেন। আপনি সে সময়ে ভাগলপুরে না আসিলে হয়তো এ গল্প আমি লিখিতামই না।

'মৃগয়া'র জন্ম-ইতিহাসের এই স্মৃতিটুকু জাগরূক রাখিবার জন্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পুস্তকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি

ভাগলপুর

১৫. ৫. ৪০

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মৃগয়া

বনফুল

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৪৯, শ্রাবণ ১৩৫২

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২০. ৭. ৪৫

খুড়ো জীবনে কখনও বাঘ দেখেছেন কি না সন্দেহ,
কিন্তু বাঘের থাবার, গোঁফের,
ডোরা ডোরা কালো দাগের
এমন নিখুঁত রকম বর্ণনা ক'রে চলেছেন যে,
টোকন, চাঁপা তো বটেই,
বড়বাবু পর্যন্ত মুগ্ধ।

দু হাতে কেরোসিন তেল মেখে
তালুকদার মশাই সাফ করতে লেগে গেছেন
তাঁর উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া
সাবেককালের গাদা বন্দুকটা।
একনলা বটে,
মরচেও পড়েছে,
কিন্তু আসল 'স্টীল'।
একালে নিতান্তই দুর্লভ।

বাদল ডাক্তার
শব্দসহকারে কিছু বলছেন না বটে,
কিন্তু ভারী মুখখানাতে
ফুটিয়ে রেখেছেন এমন একখানা হাসি,
যার নীরব মুখরতা
সত্যই শিল্পীজনোচিত।

বুড়ো হরু মণ্ডল বর্শা শানাচ্ছে
এবং তার সঙ্গোপাঙ্গদের বলছে,

এই বর্শায় ভালুক গেঁথেছি, শূয়োর মেরেছি,
ঘায়েল করেছি ময়াল সাপকে,
পাগলা হাতীর মাথা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করেছি,
মানুষও নিস্তার পায় নি।
বাকি ছিল শুধু বাঘ,
জামাইবাবুর কল্যাণে সেটাও হবে এবার।
হরু মণ্ডলের কুচকুচে কালো রঙ,
প্রশস্ত ছাতি,
রক্তাভ টানা টানা চোখ,
পেশীবহুল দেহসৌষ্ঠব,
পুষ্ট পাকানো ধবধবে সাদা এক জোড়া গোঁফ ;
কথায়
চোখে
বলিষ্ঠ পৌরুষ-ভঙ্গিমা।
তার কথায় খুশি হচ্ছিল সবাই,
কেবল একটি লোক ছাড়া,
সে তার তৃতীয় পক্ষের বালিকা বধূ কুসুম।
বড় ভীতু সে।
মসলা বাটতে বাটতে
ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে
সে চেয়ে চেয়ে বর্শা শানানো দেখছিল।
ভাবছিল,
বাপের বাড়িতে সবাই 'অপয়া' বলত তাকে,
জন্ম হবামাত্রই মাকে খেয়েছে,

কিছুদিন পর বাপকে,
ভাইগুলিও নেই।
নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই
বিয়ে করেছে তাকে মণ্ডল।
শেষে কি—!
আর সে ভাবতে পারলে না,
বহির্মুখী নিশ্বাসটাকে নিরুদ্ধ ক'রে
সে সবেগে ঘষতে লাগল কঠিন নোড়াটা
লঙ্কা-মাখা শিলের বুকে।
তার বড় বড় চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি
অবলুপ্ত হয়ে রইল
অবগুণ্ঠনের তলায়।

মুশকিলে পড়েছে ঝাংরু সর্দ্দার।
সেই চিরন্তন মুশকিল!
ঝাংরুর চেহারাটিও দেখবার মত—
মাথায় বাবরি চুল,
বেঁটে, বলিষ্ঠ,
কষ্টিপাথরে কোঁদা চেহারা।
রক্তজবার প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ
কানে চুলে সর্ব্বদাই জ্বলজ্বল করছে।
তালরস-রসিক।
কিন্তু ওর সাঁওতালত্ব নিখুঁত থাকতে পায় নি
সভ্যতার আওতায়।

চুকাতে আর তৃপ্তি হয় না,
বিড়ি খেতে হয়,
সিগারেটের প্রতিও মোহ আছে।
বাঁশী, মাদল এখনও বাজায় বটে,
কিন্তু গ্রামোফোন কেনবার শখ আছে প্রচুর,
পয়সা নেই ব'লেই কিনতে পারে না।
কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে ওকে মোহিনী গোহুমনা।
গোহুমনা মানে গোখরো সাপ,
গোখরো সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যও আছে মেয়েটির।
মেটে মেটে রঙ,
রেগে গেলে
নীল চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত ক'রে
পাতলা কোমরে হাত দিয়ে
গ্রীবা উন্নত ক'রে যখন দাঁড়ায়,
তখন সত্যিই মনে হয়, গোখরো সাপ ফণা ধরেছে।
জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে।
মা খাঁটি মেথরানী,
বাপ খাঁটি সায়েব।
জন্মের সময় আঁতুড়-ঘরে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল,
তাই ওর নাম গোহুমনা।
নামের মর্য্যাদা ও রক্ষা করেছে ;
ওর বিষদন্তের তীক্ষ্ণ আঘাতে
মারা গেছে এবং জখম হয়েছে
হিরণপুর গ্রামের অনেকে।

জমিদারের বড় ছেলে,

ম্যানেজার,

নায়েব,

জমাদার,

পিয়াদা—

সকলকেই এক আধ বার ছুবলেছে গোহমনা ;

কিন্তু ধরা পড়ে নি কোথাও।

এমন সময় সাঁওতাল-পরগণার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে

হাজির হ'ল এসে ঝাংরু—

ভ্রমরকৃষ্ণ কালো বাবরিতে জবাফুল গুঁজে

হাতে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে

বাবুদের বাড়ির নতুন হাতীটার নতুন মাহুত-রূপে।

ধরা পড়ল গোহমনা,

গৃহস্থালীর চুপড়িতে গিয়ে ঢুকল বন্য সর্পিনী।

বিষদন্তের বিষ

রূপান্তরিত হ'ল অমৃতে,

জাগল নূতন জগতে,

লাগল নূতন রঙ।

কিন্তু তবু গোহমনা তো,

ফণা তোলা স্বভাবটা গেল না।

মাঝে মাঝে ফণা তোলে,

ফোঁস ক'রে ওঠে।

ঝাংরু মনে মনে হাসে,

কিন্তু বাইরে ভান করে, ভয় পেয়েছে।

স্নান না করলে উপায় আছে!

এলিয়ে পড়া মাথার খোঁপাটা দু হাতে জড়াতে জড়াতে

গোহুম্না বললে,

আমি যাব না।

যাবি না কেন?

আমি গিয়ে কি করব? শিকারের আমি কি বুঝি?

ঝাংরু হেসে জবাব দিলে,

তোর চেয়ে বড় শিকারী

আছে নাকি আর কেউ হিরণপুরে?

পা পড়ল পুচ্ছে,

ফোঁস ক'রে উঠল, গোহুম্না,

গ্রীবাভঙ্গী ক'রে বললে, তার মানে?

ঢোক গিলে থতমত খেয়ে বললে ঝাংরু,

মানে, মন কেমন করবে।

কদিন থাকতে হবে বাইরে তার ঠিক নেই,

দূর তো কম নয়,

পাকা দশটি ক্রোশ।

কলমিপুরের মাঠ পেরিয়ে,

ময়না নদীর ওপারের সেই জঙ্গলটায় যেতে হবে।

পারব না তোকে ছেড়ে থাকতে এতদিন।

কোমর ঘুরিয়ে বললে গোহুম্না,

আমায় নতুন শাড়ি কিনে দে তবে।

এই ময়লা শাড়ি প'রে আমি যাব না।

মুশকিলে পড়ল ঝাংরু।

তুলালিচাঁদের দোকানে ধার তো বেড়েই চলেছে।
দ'মে গেল মনে মনে,
তবু বললে, আচ্ছা, দেব, তাই দেব।
আমি যাব কিসে চ'ড়ে ?
তুই তো যাবি হাতীতে।
হাতীর পিঠে থাকবে বাবুরা,
আমি কি ল্যাজ ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাব নাকি ?
হেসে লুটিয়ে পড়ল গোহুম্না।
ঝাংরু বললে, তার জন্যে ভাবনা কি,
গরুর গাড়ি যাবে পঁচিশখানা।
তাঁবু,
বাসনকোসন,
আসবাবপত্তর
সব যাবে তো!
তুই তারই একটাতে চ'ড়ে বসিস।
বিরিঞ্চিকে ব'লে দেব আমি।
নিজে যাবেন হাতীতে,
আমার বেলায় গরুর গাড়ি!
ইস, ভারি আমার—!
যে কথাটি দিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করলে গোহুম্না,
ভদ্রসমাজে তা প্রচলিত নয়।
ঝাংরু তখন মোক্ষম অস্ত্রটি হানলে,
গম্ভীর হয়ে গেল।
বার দুই আড়চোখে ঝাংরুর দিকে চেয়ে

ফিক ক'রে হেসে ফেললে গোছমনি,
বললে,
ইস, পুরুষের রাগ দেখ না!
ঝাংরু তবু গম্ভীর।
যাব, যাব, যাব গো,
তোমার বিরিঞ্চির গাড়িতে চেপেই যাব,
তুমি একটু হাস দিকিনি।
হেসে ফেললে ঝাংরু।

পাঁজির পাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি
ব'সে ছিলেন নীলাম্বর দত্ত,
ভুরু কুঁচকে।
বার্ত্তা শুভ নয়।
কিন্তু আজকালকার বাবুরা,
বিশেষ ক'রে ওই বিলেত-ফেরত জামাইবাবুটি,
মানবেন না পাঁজির বারণ।
ত্র্যহস্পর্শের তীব্রতা
স্পর্শ করতে পারবে না ওঁদের হৃদয়কে।
যখন ঠিক করেছেন,
তখন নির্ঘাত ওই দিনেই বেরুবেন,
এবং নীলু দত্তকেও হতে হবে সহযাত্রী।
নীলু দত্ত শিকারী নন—মুহুরী।
শিকারীরা করবেন শিকার,
নীলু দত্তকে করতে হবে আয়োজন।

লোকও এক-আধজন নয়,
সবসুদ্ধ মিলে শতখানেকের কাছাকাছি যাবে।
এত লোকের খাবার আয়োজন,
শোবার আয়োজন,
স্নানের আয়োজন,
তা ছাড়া
বড়বাবু, মেজোবাবু, ছোটবাবু প্রত্যেকের জন্যেই
'বিশেষ' একটু আয়োজন
করতে হবে গোপনে গোপনে।
সব ভার নীলু দত্তের ওপর।
কিন্তু পাঁজির দিকে চেয়ে
চিন্তিত হয়ে পড়লেন দত্ত মশাই।
একদিন আগেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়!
বড়বাবুকে বুঝিয়ে বললে
আপত্তি করবেন না বোধ হয় তিনি।
তাঁবু-টাবু গাড়াতে হবে,
মাচান তৈরি করাতে হবে,
যোগাড় করতে হবে একটা মোষের বাচ্চা,
একদিন আগে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।
যুক্তির সূর্য্যকে কিন্তু আবৃত ক'রে রেখেছে
ছোট একখানি মেঘ।
একদিন আগে গেলে
লাহিড়ীটা অব্যাহতভাবে গ্রাস ক'রে থাকবে বড়বাবুকে।
অতিশয় কষ্টদায়ক চিন্তা।

অথচ পাঞ্জিকেও—!
নীলু দত্তের ভুরু আরও কুঁচকে গেল।
পাশের ঘরে ভাইপো দুটো হুড়োহুড়ি করছিল,
রোজই করে,
আজ কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল ;
উঠে গিয়ে
ঠাস ঠাস ক'রে চড়িয়ে দিলেন তাদের।
তারপর হঠাৎ তাক থেকে পাড়লেন
খেরো-বাঁধানো চটি একখানা খাতা,
কি খানিকক্ষণ দেখলেন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে,
তারপর উঠে পড়লেন ;
পায়ে দিলেন ময়লা ক্যাম্বিসের জুতোটা,
তালি-দেওয়া ছাতাটা বগলে ক'রে
বেরিয়ে পড়লেন খাতাটা নিয়ে।
নীলাম্বর এককালে সুদর্শন ছিলেন
এবং সেজন্য গর্ব্বও ছিল তাঁর মনে মনে।
কিন্তু পরিহাস-রসিক বিধাতা
পরিহাস করলেন।
যদিও একটু স্থূলগোছের,
কিন্তু দত্তের পক্ষে মর্ম্মান্তিক।
হঠাৎ মাথায়, দাড়িতে, গোঁফে
খাবছা খাবছা টাক প'ড়ে গেল।
কামিয়ে ফেলতে হ'ল সব।
বৃহৎ নাকটা বৃহত্তর হয়ে গেল,

অনাবৃত হ'ল মুখের বলিরেখা,
স্পষ্টতর হ'ল মুহুরিয়ানা চোখের দৃষ্টিতে,
শরীরটা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ল সামনে দিকে।
তবু বাবুরা প্রসন্ন আছেন আজও—
এইটুকুই ভরসা নীলু দত্তের।
বাবুদের অনুগ্রহে সে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না,
না, লাহিড়ীকেও নয়।
হ'লই বা সে বড়বাবুর বন্ধুর ভায়রাভাই
এবং এম. এ. পাস।
খেরোর খাতা বগলে ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত
বাবুদের বাড়ির দিকে।
এই শিকার-অভিযানের জন্যে যা যা দরকার
এবং কত রকম যে দরকার
এবং কত রকম ভাবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে,
তা সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি
খেরোর খাতাখানায়।
সেটা বাবুদের দেখাতে হবে বইকি।
দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় ক'রে
ছুটতে লাগলেন নীলাম্বর দত্ত।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী
এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন আত্মীয়তার দাবিতে,
কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মোসায়েবের পদবীতে
দিলদরিয়া বড়বাবুর আসরে।

বড়বাবু যে তাঁর জাতি-নির্ণয়ে অসমর্থ হয়েছিলেন তা নয়,
মন্ত-পিপাসু ব্যক্তিটির স্বরূপ ঠিক চিনেছিলেন তিনি
এবং সেইজন্যেই
অসীম করুণাভরে সহ্য করতেন তাঁকে।
লাহিড়ীর যোগ্যতাও ছিল কিঞ্চিৎ,
শুধু যে সুকান্তি, সুকণ্ঠ, সুবিদ্বান তাই নয়,
সুপারিষদও।
গলায় কাপড় দিয়ে, হাতজোড় ক'রে
হেঁ-হেঁ করেন না তিনি।
যখন খোশামোদ করেন,
চট ক'রে বোঝা যায় না যে খোশামোদ করছেন।
ভর্ৎসনা, অনুযোগ, বিস্ময়, নীরব হাস্য, আক্ষেপ,
নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাঁর খোশামোদ।
এই শিকার-ব্যাপারে
বড়বাবুর ভগ্ন স্বাস্থ্য,
নিদারুণ গরম,
নতুন হাতীটার বদমেজাজ
এবং আরও অনেক রকম কারণ দেখিয়ে
আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন সকলকে।
কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বড়বাবু
এই ছদ্মবেশী হিতৈষণার অন্তরালে
প্রত্যক্ষ করেছেন অসহায় লাহিড়ীকে—
ষড়রিপুবিধ্বস্ত আদর্শচ্যুত বিদ্বান ব্যক্তিটিকে,
যার শখ আছে, কিন্তু শক্তি নেই,

যে গলগ্রহ হয়েও
প্রাণপণে চেষ্টা করছে আত্মসম্মানের মুখোশটা আঁকড়ে থাকতে,
যার বিকশিত দন্তের অত্যুচ্ছ্বসিত প্রাণহীন হাসি
ঢেকেও ঢাকতে পারছে না অন্তরের অন্তহীন ক্রন্দনকে।
উপভোগ করছেন বড়বাবু
লাহিড়ীর এই হিতোপদেশ-জারিত খোশামোদ।
সেই চিরন্তন খোশামোদ,
যা চিরকাল খুশি ক'রে এসেছে
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মন।

বুড়ো জগদেও পাঁড়ে
এই শিকার ব্যাপদেশে
বীরত্ব প্রকাশ করেছে শুধু টোকনের কাছে,
তাও অতি নিভৃতে।
বুড়ো জগদেও পাঁড়েকে
উর্দি-টুর্দি পরলে খানিকটা জমকালো দেখায় বটে,
কিন্তু সাজ-পোশাক খুলে নিলে
পালক-ছাড়ানো হাঁসের মত অবস্থা তার।
লিকলিকে রোগা,
নিদারুণ লম্বা,
মুখখানাতেই একটু জাঁকজমক আছে এখনও।
দ্বিধা-বিভক্ত পাকা দাড়ি
গুম্ফ সহযোগে
এখনও কর্ণ পরিক্রমা করছে বটে,

কিন্তু সাবেককালের সে জলুস আর নাই।
সেকালের কৃষ্ণকুঞ্চিত বিভীষিকা
রূপান্তরিত হয়েছে
শুভ্র সুন্দর প্রশান্তিতে।
চোখের দৃষ্টিতে যৌবনকালের সিংহসুলভ দীপ্তি আর নেই।
তার বদলে
একটা সকৌতুক ছেলেমানুষি হাসি
চিকমিক করছে সর্ব্বদা।
জগদেও পাঁড়ে নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি,
চারিদিকে গজিয়েছে এখন সবুজ ঘাস।
কেউ আর মানে না তাকে।
কিন্তু এখনও
এই জগদেও পাঁড়ে
কারও হাত যদি একবার চেপে ধরে,
ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব।
সরু সরু আঙুলগুলোতে এখনও আছে
বজ্রের মত শক্তি।
স্বর্গীয় কর্ত্তা মশাই,
অর্থাৎ বর্ত্তমান বাবুদের পিতাঠাকুর,
বাহাল করেছিলেন জগদেওকে।
এ বাড়ির অনেক নিমক ও ধমক
পরিপাক ক'রে
জগদেও বর্ত্তমানে পরিপাক করছে পেন্‌শন।
ওর স্থানে

বড়বাবু
বাহাল করেছেন যে নাবালকটিকে,
তার নানা প্রকার অপটুতা
অনুকম্পার চক্ষে দেখে জগদেও।
এই কিশোর সিংকেই কাজকর্মে ওয়াকিবহাল ক'রে দেবার ছুতোয়
জগদেও
দেউড়ি আঁকড়ে প'ড়ে আছে এখনও।
আসলে,
এতকালের পুরনো দেউড়ি ছেড়ে যেতে প্রাণ চায় না।
প্রথম যৌবন থেকে শুরু ক'রে
সারা জীবনটাই তো এইখানে কাটল।
চম্পারণ জেলায় কে চেনে তাকে!
আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই,
সব ম'রে-হেজে গেছে;
এইখানেই শতবন্ধনে সে জড়িয়েছে নিজেকে।
বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু—
তার সামনেই বড় হ'ল সবাই।
ওদের নানা বয়সের
কত দৌরাত্ম্যই না সহ্য করেছে সে।
এই জগদেও পাঁড়েই বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে সকলের।
বহুমায়ীদের পালকির পেছনে পেছনে
সগর্বে এসেছে লম্বা লাঠি ঘাড়ে ক'রে।
তাদের মেয়ে হ'ল, ছেলে হ'ল,
তারাও আবার দৌরাত্ম্য করতে লাগল পাঁড়ের ওপর।

উষাদিদির বিয়েও সে দেখলে।
তারও আবার ছেলে হবে,
সেও হয়তো একদিন এসে চড়বে
জগদেও পাঁড়ের কাঁধে,
টানবে দাড়ি ধ'রে।
ভারি ভাল লাগে ছোট ছেলেদের।
ভাব তাদের সঙ্গেই,
ছোটবাবুর ছোট ছেলে টোকনের সঙ্গে বিশেষ ক'রে।
তাকেই সে গোপনে বলেছে,
বাঘকে হাতের কাছে পেলে
তার পুছড়ি পাকড়ে
এইসা এক পটকান দেবে
যে, জান নিকলে যাবে বাছাধনের।
টোকন শিশুমহলে
চোখ বড় বড় ক'রে
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে বার্ত্তাটা।

বিপিন ঘোষ
গ্রামের সরকারী ঠাকুরদা।
আবালবৃদ্ধবনিতা
সকলের সঙ্গেই ইয়াকি আদান-প্রদান করেন,
এমন কি স্বকীয় বৃদ্ধা গৃহিণীর সঙ্গেও।
হাজির হলেন তিনি মেজবাবুর বৈঠকখানায়।
বললেন,

তোমাদের জামাই-হিট্‌লারের ভয়ে
ব্যাঘ্রসমাজ চেম্বার্‌লেন পাঠিয়েছেন আমার কাছে।
তোমার ঠানদি বুঝতে পারেন নি বটে,
আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম।
মেজবাবু বললেন, কি রকম?
কাল থেকে
একদম অচেনা একটা রোগা বেড়াল এসে জুটেছে।
ভিজে ভিজে ভাব,
মাঝে মাঝে সকরুণভাবে চাইছে।
আমার বিশ্বাস,
ব্যাঘ্রসমাজের দূত ও,
আমার মারফৎ সন্ধির প্রস্তাব করতে চায়
তোমাদের জামাইয়ের কাছে।
আমি হয়তো রাজিও হয়ে যেতুম,
কিন্তু কাল একটু যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি,
টপ ক'রে মাছটি তুলে নিয়েছে পাত থেকে।
সুতরাং অ-ক্ষম হয়ে পড়েছি,
ও পাষণ্ডদের আর ক্ষমা করতে পারব না।
এমন কি মনস্থ করেছি,
আমিও তোমাদের অভিযানে যোগদান করব।
মেজবাবু বললেন, ঠানদি?
তাঁর জন্যেই যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে।
হেলে দুলে হাসতে হাসতে গেলেন ঠাকুরদা
বড়বাবুর কামরায়।

বললেন,

দেখ ভায়া,

আমিও যাচ্ছি,

কিন্তু হাতীতে, ঘোড়াতে অথবা গরুর গাড়িতে যাব না,

আমার চাই পালকি।

অর্থাৎ তোমার ঠানদিও যেতে চাইছেন,

পতিব্রতা নারীকে ঠেকানো মুশকিল।

বড়বাবু হেসে বললেন, বেশ তো।

গলার স্বর একটু খাটো ক'রে বললেন ঠাকুরদা,

সুবিধেও হবে।

তোমাদের ঠানদিকে চেনো তো ?

রিজার্ভ ফোর্স।

তোমাদের জামাইয়ের বন্দুক ফেল করলেও করতে পারে,

তোমাদের ঠানদি ফেল করবেন না কখনও।

ওইটুকু ছোট্ট মানুষ তো,

কিন্তু একবার গাছকোমর বেঁধে দাঁড়ান যদি,

বাঘেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

বড়বাবু তাঁর স্বাভাবিক দরাজ কণ্ঠে

অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।

ঠাকুরদা গেলেন তারপর ছোটবাবুর কাছে।

ছোটবাবুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন,

ভায়া,

তোমাদের নীলু দত্তকে ব'লে দিও,

একটু নিরিমিষ-টিরিমিষের ব্যবস্থাও যেন রাখে

তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে
বাগান-বাড়িতে লুকিয়ে-চুরিয়ে যা-ই করি,
সকলের সামনে স্বেচ্ছাচরণ করতে পারব না।
বিশেষত,
তোমাদের ঠানদিও সঙ্গে যাচ্ছেন যখন
কোশাকুশি তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি নিয়ে।
দেখো ভায়া,
ডুবিও না আমাকে যেন শেষকালে।
ছোটবাবু বললেন,
ঠানদিকেও আমরা দলভুক্ত ক'রে নেব,
ভাবছেন কেন আপনি!
ঠাকুরদা হেসে বললেন,
ঠানদি তোমাদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন হয়তো,
কিন্তু আমাকে তোমাদের দলভুক্ত দেখলে
খুশি হবেন না একটুও।
বাইরে থেকে আমার দুরবস্থাটা
তোমাদের নয়নগোচর হবে না ভায়া,
কিন্তু গজভুক্ত কপিত্থবৎ
আমার শূন্যতাটা অনুভব করতে থাকব আমিই কেবল।
ছোটবাবু চক্ষু দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বললেন,
এত ভয় করেন আপনি ঠানদিকে?
ঠাকুরদা বললেন,
বিয়ে করেছ তরঙ্গিণীকে,
ক্ষেমঙ্করীর খবর জানবে কি ক'রে বল?

মোট কথা,
বিপদে ফেলো না আমায় ভাই।
হেসে দুলে চ'লে গেলেন ঠাকুরদা।
নাতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি,
নগ্নগাত্র,
বুকময় কাঁচাপাকা চুল,
দক্ষিণ বাহুমূলে একটি রুদ্রাক্ষ,
পরনে থান,
পায়ে চটি।

অন্তঃপুরেও চঞ্চলতা জেগেছিল।
বৃদ্ধা গৃহিণী সেকেলে মানুষ,
মনে মনে তিনি সমর্থন করছিলেন না
মেয়েদের এই হুজুক-প্রবণতা।
বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের ওপরই
কেমন যেন অপ্রসন্ন তিনি।
তাদের আদিখ্যেতা,
বেহায়াপনা,
তাদের খুরওলা জুতো,
সুরওলা কথা,
তাদের কাঁধকাটা জামা,
নানা ছাঁদের শাড়ি,
অ্যাটাচি কেস, স্যুট কেস, ব্লাউজ কেস, ভ্যানিটি ব্যাগ,
ক্রীম, স্নো, রুজ, পাউডার,

যখন তখন গুনগুনিয়ে গান গাওয়া
খুকীপনা,
ন্যাকামি,
ধিঙ্গির মতন ঘুরে বেড়ানো—
কিছুই ভাল লাগে না তাঁর।
সব যেন বদলে যাচ্ছে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল—
সংস্কৃত মন্ত্র, লাল চেলী, পূজো-হোমের আবহাওয়ায়,
একশোটা ঢাকী এসেছিল,
একশোটা ঢুলী,
রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, নহবৎ, যাত্রা, ঢপ,
বরযাত্রী কন্যাযাত্রীতে মারামারি হয়েছিল,
লোক খেয়েছিল এক মাস ধ'রে,
চারটে বড় বড় হাঁড়া,
ছখানা পরাত
হারিয়েই গেছল গোলমালে।
এখন সেসব উঠে যাচ্ছে নাকি!
সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা
চুপিচুপি বিয়ে ক'রে আসছে আদালতে নাম সই ক'রে।
কালে কালে কতই যে হবে!
এই তো নিজের নাতনী উষা,
তাকে কলেজেও পড়াতে হ'ল,
বিয়েও দিতে হ'ল এক বিলেত-ফেরতের সঙ্গে।
তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছিল ন বছরে

কুল, গোত্র, কুষ্ঠি বিচার ক'রে।
এর বিয়ে হ'ল উনিশ বছরে
কিচ্ছু বিচার না ক'রেই।
সবাই দেখলে কেবল ছেলের উপার্জ্জন-ক্ষমতাটা।
ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না কেউ,
নিজেরাই সব দেখে শুনে দিতে চায়।
অন্য কিছু দেখে না কিন্তু আজকাল,
দেখে কেবল টাকার দিকটাই।
কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ সবাই দেখছে টাকা,
টাকা না হ'লে বিয়ে হবে না।
ওই যে উষার কলেজী বন্ধুটি এসেছে,
তার এখনও বিয়ে হয় নি,
অথচ একটা মাগী!
নামেরই বা কি ছিরি
—মীনা!
বীণা হ'লেও বা মানে বোঝা যেত।
নাতজামাই বাঘ শিকার করতে আসছে,
আসুক না!
গুষ্টিসুদ্ধুর মেতে ওঠবার কি আছে তাতে!
আগেও তো কর্ত্তারা শিকারে যেতেন,
বড় বড় বাঘও মেরেছেন কত,
কিন্তু কই,
মেয়েরা কখনও তাঁদের সঙ্গী হতে চায় নি তো!
শিকারে সঙ্গী হওয়া দূরে থাক্,

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত
ঘোমটা খোলবারই সাহস হ'ত না কারও।
মেয়েদের জগৎই ছিল আলাদা।
জা, ননদ, শাশুড়ী, ছেলে, মেয়ে,
দূরসম্পর্কের পোষ্য-আত্মীয়ার দল,
পাড়াপড়শী,
অতিথি-ভিকিরি,
পূজো-পার্ব্বণ,
এদেরেই কেন্দ্র ক'রে জীবন কাটত।
পুরুষদের বার-মহলের খবর
মাঝে মাঝে পৌঁছত এসে বটে অন্তঃপুরে—
কখনও আবছাভাবে,
কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে,
আন্দোলিতও করত মনকে,
কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।
সেকালের মেয়েরা
পুরুষদের সঙ্গে
এমন ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে,
এমন লেপটে থাকতে পারত না।
তারা অবলা অশিক্ষিতা ছিল হয়তো,
কিন্তু তাদের এমন একটা মৌন মর্য্যাদা ছিল,
যা একালের মেয়েদের নেই।
এরা মুখে বাহাদুরি করে বটে—
আমরা তোয়াক্কা করি না পুরুষদের,

আমরা স্বাধীন,
আমরা স্বাবলম্বী ;
কিন্তু ওটা যে শুধু ওদের মুখেরই কথামাত্র,
তা ওদের চোখের দৃষ্টিতে লেখা রয়েছে ।
ছুং ছুং ক'রে বেড়াচ্ছে যেন সব ।
আমাদের কালে
'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ' ব'লে একটা কথা ছিল বটে,
কিন্তু পেটে ক্ষিধে মুখে অ-ক্ষিধের আস্ফালন—
একটা নতুন ব্যাপার ।
বৃদ্ধা গৃহিণী
ঠাকুরঘরে ব'সে ব'সে
হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে
এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিলেন ।
এমন সময়
ছোট বউ তরঙ্গিণী এসে বললেন,
ও মা, শুনছেন—
স্থরেন চিঠি লিখেছে,
আপনাকে স্থদ্ধু যেতে হবে শিকারে,
আপনি না গেলে ও যাবেই না লিখেছে,
এই নিন চিঠি ।
বৃদ্ধা গৃহিণী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ,
তারপর বললেন,
ক্ষ্যাপা, না পাগল !
সবাই কি ক্ষেপে গেলি নাকি তোরা !

আমি বুড়ো মানুষ, কোথায় যাব !
তরঙ্গিণী মুখ টিপে একটু হেসে চ'লে গেলেন ।
গৃহিণী ব'সে ব'সে ঘোরাতে লাগলেন মালা,
কিন্তু তাঁর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল
বেণী-দোলানো এক খুকী,
যে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে
বায়না করত নাগরদোলায় চড়বার জন্যে,
মেলায় যাবার জন্যে,
যাত্রা শোনবার সময় আসর ঘেঁষে বসবার জন্যে,
যে নাক বেঁধাতে আপত্তি করে নি নোলক পরবার জন্যে,
যে পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত,
ঝড় উঠলে আমবাগানে ছুটত,
সামান্য পুঁতির জন্যে লালায়িত হ'ত,
পুতুলের সংসার নিয়ে মেতে থাকত,
দাদার সঙ্গে লুকিয়ে আচার চুরি করত—
সেই খুকী ।
কোথায় ছিল এ ?
বিধবা বৃদ্ধা গৃহিণীর
মরচে-পড়া কড়া-পড়া মনের তলায়
ঘুমিয়ে ছিল বুঝি এতদিন,
কঠিন বীজের ভেতর কচি অঙ্কুরের মত ।
অনুকূল আলো-বাতাসে
কচি কচি পাতা দুটি মেলে

আকাশের দিকে তাকাল আজ।
নাত-জামাইয়ের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে
বৃদ্ধা গৃহিণী চেয়ে দেখলেন নিজের মনের দিকে,
কুচকুচে কালো কচি এক জোড়া চোখ
আনন্দে উৎসাহে ভাষাময় হয়ে উঠেছে।
অবাক হয়ে গেলেন তিনি মনের কাণ্ড দেখে,
প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলেন সবেগে
হরিনামের মালাটা।

ছোট বউ তরঙ্গিণী,
সত্যিই যেন তরঙ্গিণী।
কথায়-বার্ত্তায়
হাব-ভাবে
এমন একটা তরল প্রাণোচ্ছলতা বড় দেখা যায় না।
হাসিতে গিটকিরি আছে,
হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে,
মুখ টিপে মুচকি হাসে যখন,
তখন আরও বেশি ক'রে পড়ে।
চলনে আছে ভঙ্গিমা,
বলনে রঙ্গিমা,
ছিপছিপে দোহারা গড়ন,
টিকোলো নাক মুখ চোখ,
টকটকে রঙ,
মাথায় চওড়া সিঁদুর,

পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি,
ঠোঁট দুটি পানের রঙে টুকটুক করছে সর্বদাই।
পঁচিশ বছর বয়স হ'ল,
তবু এখনও কাঁচপোকার টিপটি পরা চাই।
বছর আষ্টেক আগে টোকন হয়েছিল,
আর ছেলেপিলে হয় নি।
তরঙ্গিণী
মেজ জা হিরণ্ময়ীর মহলে গিয়ে উঁকি দিলেন।
বললেন,
মেজদি, মাকে দিয়ে এলুম খবরটা।
মুখে যদিও আপত্তি করলেন,
কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল নিমরাজি।
খুব মোক্ষম বুদ্ধিটা বার করেছিলে যা হোক!
উষাটাকে কিন্তু সামলে রেখো—
যা বকর বকর করে ও,
সব কথা ফাঁস না ক'রে দেয় শেষকালে!
কলেজে পড়লে কি হবে,
কিচ্ছু বুদ্ধি নেই ওর!
ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারটায় চাবি দিতে দিতে
হিরণ্ময়ী বললেন,
তুই নিজেকে সামলে রাখ্ দিকি।
উষাকে আমার তত ভয় নেই,
যত ভয় তোকে।
ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে

চ'লে গেলেন তরঙ্গিণী নিজের ঘরে।
ঘরে গিয়ে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিতে নিতে
কল্পনায় দেখতে লাগলেন—
প্রকাণ্ড একটা মাঠ,
তাতে তাঁবু,
তাঁবুর ভেতর আর কেউ নেই,
কেবল—।
মুচকি হাসি ফুটে উঠল মুখে,
টোল পড়ল গালে।

হিরণ্ময়ীর গায়ে অন্যান্য বউদের মত
সোনার গহনা অবশ্য প্রচুর ছিল,
কিন্তু গায়ের রঙে ছিল না স্বর্ণ-দ্যুতি।
হিরণ্ময়ী শ্যামাঙ্গিনী।
চোখ-মুখও যে অসাধারণ রকম সুন্দর
তা নয়,
সাদামাটা।
বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।
ছেলেপিলে হয় নি,
সুতরাং ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনীও।
বড় বনিয়াদী বংশের মেয়ে।
একদা

যে বংশের দৌলতে
রূপের অনটন সত্ত্বেও
এ বাড়ির বধূপদে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন,
এ যাবৎ তিনি
সে বংশের মর্য্যাদা
রক্ষা ক'রে এসেছেন সগৌরবে।
এ বাড়ির সকলেরই তিনি মা।
নিজের স্বামীর প্রতিও তাঁর যে স্নেহ
তা অপত্যস্নেহ।
বাড়ির ঝি চাকর থেকে শুরু ক'রে
বড়বাবু পর্য্যন্ত
সকলেই তাঁর দাক্ষিণ্যভোগী।
বড়বাবুর সমস্ত পাঞ্জাবি
মেজ মার হাতের তৈরি।
আহারাদির পর
মেজ মার হাতের তৈরি খিলি চারেক পান না খেলে
তৃপ্তিই হয় না তাঁর।
বৃদ্ধা গৃহিণীও
মেজ বউয়ের হাতের রান্না খাবার জন্যে লোলুপ।
তার মতে এ বাড়িতে
অমন স্বক্ত আর কেউ নাকি রাঁধতে পারে না।
বাড়ির যত ছোট ছেলেমেয়ের আশ্রয়
মেজ মা।
টোকনকে,

বড় তার ছেলে খোকনকে—
মেজ মা-ই মানুষ করেছেন।
খোকন কলকাতায় আইন পড়ছে,
আসবে না সে এখন ;
এজন্য মেজ মার মন একটু খুঁতখুঁত করছে।
ভেবেছিলেন,
সুরেনকে লিখে দেবেন সঙ্গে ক'রে আনতে,
কিন্তু বড়দির ভয়ে পারেন নি।
বড় কড়া মেজাজের মানুষ বড়দি।
আশ্রিতারূপে
দূরসম্পর্কের এক ননদ এসেছে বাড়িতে,
বড় মাটো বেচারী।
মেজ মা না থাকলে
বড়দির প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করা
অসম্ভব হ'ত তার পক্ষে।
তার পাঁচ বছরের ছেলে জিতু
(এখন সে গেছে তার এক মাসীর কাছে)
যখন এখানে থাকে,
মেজ মার কাছেই শোয় রাত্তিরে।
বড়দির মেয়ে উষার যাবতীয় দুষ্কৃতি
মেজ মা-ই চাপাচুপি দিয়ে এসেছেন এতকাল।
কলকাতায় যখন পড়তে গেল উষা,
প্রতি মাসেই তার খরচের অঙ্ক
বরাদ্দ টাকার অঙ্ককে ডিঙিয়ে যেত,

পূরণ করতে হ'ত মেজ মাকে
গোপনে গোপনে।
ভাগ্যে বিয়ে হয়েছে
বড়লোকের ছেলে বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারের সঙ্গে!
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন মেজ মা।
ভাগ্যের কথা বলা তো যায় না,
যদি গরিবের ঘরে পড়ত উষা,
কি দুর্দ্দশাই যে হ'ত ওই খরুচে মেয়ের!
সে দুর্ভাবনাটা গেছে বটে,
কিন্তু আর একটা নতুন দুর্ভাবনা জুটেছে।
তরঙ্গিণীর এক দূরসম্পর্কের ভাই—
হারেন
এসেছে ছুটিতে বেড়াতে।
উষার সম্পর্কে মামা হয়,
কিন্তু বয়স বেশি নয়।
বড় জোর
উষার চেয়ে বছর তিন-চার বড় হবে।
ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে গিয়ে
কি যে কাণ্ড করে উষা তার সঙ্গে!
হাসাহাসি, হুড়োহুড়ি, ব্যাট-কাড়াকাড়ি—
বিশ্রী দৃষ্টিকটু ব্যাপার!
দিদি এতদিন এটা লক্ষ্য করেন নি,
সেদিন কে যেন তাঁর কানে তুলে দিয়েছে কথাটা,
রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মেজ মাও পছন্দ করেন না এসব,
তবু উষার হয়ে সাফাই গাইতে হ'ল তাঁকে।
ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজটা বন্ধ ক'রে
বেরিয়ে এলেন মেজ মা,
তাঁর খাস ঝি কাদম্বিনীকে ডেকে বললেন,
কই, কোথায় ময়রা-বউ ?
ডেকে দে তাকে।
কালো-কোলো ময়রা-বউ এল একটু পরে
সসঙ্কোচে।
তার নাকে প্রকাণ্ড নথ,
নথে টানা,—
লাগাম টেনে সামলে রেখেছে যেন নথটাকে।
মেজ মা বললেন,
ময়রা-বউ,
আমার জন্যে সের দশেক কাঁচাগোল্লা
তৈরি ক'রে দিতে হবে দুদিনের মধ্যে
আলাদা ক'রে।
তারপর একটু হেসে বললেন
চুপিচুপি,
পারবি তো ?
ঘাড় কাত ক'রে ময়রা-বউ জানালে, পারবে।
দাম তোর আগাম দিয়ে দিচ্ছি, নে,
জিনিস কিন্তু ভাল চাই।
সসঙ্কোচে বললে ময়রা-বউ,

দাম পরে নোব মেজ মা,
জিনিস হোক আগে।
শুনলেন না মেজ মা সে কথা,
বললেন,
কি দরকার বাপু তার!
সেবারকার মত
গোলেমালে শেষটা ভুলে যাব আমি,
তোরাও চেয়ে নিবি না মনে ক'রে।
এক রকম জোর ক'রেই
দামটা গুঁজে দিলেন তার হাতে।
ব'লে দিলেন বার বার ক'রে,
জিনিস ভাল হওয়া চাই কিন্তু।
পুলকিত ময়রা-বউ
বেরিয়ে গেল খিড়কি-দুয়ার দিয়ে
টাকা কটি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে।
মেজ মা নিশ্চিন্ত হলেন।
শিকারে যদি যেতেই হয়,
ওই মাঠের মাঝখানে
নিজের আয়ত্তের মধ্যে কিছু খাবার না থাকলে
কিছুতে স্বস্তি পাবেন না তিনি।
ছেলে-পিলে,
চাকর-বাকর,
দাই-ঝি,
সবাই যাবে;

তা ছাড়া মেজবাবুর মিষ্টি না হ'লে মুশকিল্,
একটি বেলা চালাবার উপায় নেই।
ওখানে পাঁচ ভূতের কাণ্ড,
নিজের সঙ্গে কিছু মিষ্টি না থাকলে চলে ?
শিকারে যাবার হুজুকটি তুলেছে
ছোট বউ, উষা আর মীনা।
কলমিপুর অঞ্চলে
বাঘ বেরিয়েছে একটা।
উষা সেই খবরটি দিয়েছে স্থরেনকে,
(দেবার মতন আর খবরও পায় নি মেয়ে !)
স্থরেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে,
শিকার করতে হবে বাঘটাকে।
শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, সবাইকে চিঠি লিখেছে,
উষাকে লিখেছে, তোমাদেরও যেতে হবে।
বিলেতে মেয়েরা
হামেশাই এমন গিয়ে থাকে,
তোমরাই বা যাবে না কেন ?
এখন
'তোমরা' নামক বহুবচন সর্ব্বনামটি
স্থরেন গৌরবে ব্যবহার করেছিল কি না,
তা নির্দ্ধারণ না ক'রেই
তরঙ্গিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল
এবং উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলল মীনাকে।
মীনা মেয়েটি

একটু চাপা গম্ভীর স্বভাবের,
চট্ ক'রে চাপল্য প্রকাশ করে না ;
কিন্তু তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-আঘাতে
সেও বিচলিত হ'ল।
উমা বলতে লাগল,
নিশ্চয়ই,
সব্বাই মিলে যাব আমরা,
যাব না তো কি !
কলমিপুরের মাঠে
মজা ক'রে
তাঁবু ফেলে সব থাকা যাবে একসঙ্গে ।
সমস্ত শুনে মেজ মা বললেন,
কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে এর মধ্যে ।
বড়দি রাজি হ'লেও হতে পারেন,
জামাইয়ের অনুরোধ
হয়তো গ্রাহ্য করলেও করতে পারেন তিনি
(যদি মেজাজ ঠিক থাকে),
কিন্তু মা কিছুতে রাজি হবেন না।
আর মাকে ফেলে আমাদের যাওয়াটা
ভাল দেখাবে না।
অন্তত
আমি যেতে পারব না।
তরঙ্গিণী আবদারের সুরে বললে,
তোমাকে যেতেই হবে মেজদি,

তুমি না গেলে কেউ যাব না আমরা।
তুমি গিয়ে মাকে একটু বল না,
তোমার কথায় তো উনি ওঠেন বসেন।
স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মেজ মা ;
তারপর বললেন,
তা হ'লে এক কাজ কর্ তুই উষা,
সুরেনকে লেখ্,
মাকে যেন নেমন্তন্ন করে আলাদা ক'রে।
নাতজামাই পীড়াপীড়ি করলে
হয়তো রাজি হয়ে যেতে পারেন।
মা মনে মনে বেশ হুজুকে আছেন এদিকে,
সেবার মনে নেই,
সমস্ত রাত ব'সে যাত্রা শুনলেন—অভিমন্যুবধ ?
বড়দিকেও আলাদা একটা চিঠি লিখতে বলিস।
বড়দিকে রাজি করাও সহজ নয়,
কখন যে কি মেজাজে থাকেন ঠিক নেই,
জামাইয়ের খাতিরেই যদি রাজি হন।
মেজ মার কথামত
উষা চিঠি লিখলে সুরেনকে,
ঈপ্সিত ফলও ফলল।
বড়দি রাজি হয়েছেন,
মাও নিমরাজি।
মেজ মা নীচে নেবে যাচ্ছিলেন,
এমন সময় পেছন দিক থেকে এসে

ঝাপটে ধরলে তাঁকে টোকন্।
মেজ মা, আমাকেও একটা এয়ার-গান কিনে দাও,
আমিও জামাইবাবুর সঙ্গে বাঘ মারব
মাচায় উঠে ব'সে।
মেজ মা বললেন,
তোমার জগদেও পাঁড়ে তো বলেছে,
আছড়ে মারবে বাঘকে,
বন্দুকের আর দরকার কি?
টোকন তার বড় বড় চোখ দুটো
আরও বড় ক'রে বললে,
জান মেজ মা,
সমস্ত শুনে-টুনে জগদেও পাঁড়েও ভয় পেয়েছে!
চাঁপা যখন বললে,
বাঘকে আছড়ে মারা সোজা নাকি?
হালুম ক'রে একবার যদি তেড়ে আসে,
পালাতে পথ পাবে না তুমি।
শুনে পাঁড়ের মুখ
ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল।
তারপর আমাকে চুপিচুপি বললে,
চাঁপা যা বলছে তা ঠিক,
একটা বন্দুকই তুমি যোগাড় কর ভেইয়া।
আমাকে একটা বন্দুক কিনে দাও মেজ মা,
আঢ্যিদের দোকানে আছে—
আমি দেখে এসেছি।

মেজ মা বললেন, আচ্ছা, সে হবে এখন,
আমাকে এখন ছাড় দিকি তুই।
পাঁড়েটার মতিচ্ছন্ন ধরছে যেন দিন দিন!
মেজ মা ছদ্ম কোপে গরগর করতে করতে
নেবে গেলেন নীচে।

বাড়ির যিনি বড় বউ,
তাঁর যে এককালে ডাকনাম ছিল অনু,
তা আজকাল প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছে,
এমন কি তিনি নিজেও বোধ হয়।
এখন তিনি বড় বউ,
বিকল্পে—বড়দি।
মিষ্টি অনু নামটা হারিয়ে গেছে।
অনু নামটা অবশ্য
গুরু-গম্ভীর অনন্তময়ীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।
কাকতালীয়বৎ
মানুষ মাঝে মাঝে
এমন দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয় যে,
অবাক হতে হয়।
অনুর যেদিন জন্ম হ'ল,
সেদিন পুরোহিত মশাই ওর নামকরণ করলেন—
অনন্তময়ী।
কারণ সেদিন ছিল অনন্তচতুর্দ্দশী।
কিন্তু নামটি যে

এমন হুবহু খাপ খেয়ে যাবে

মেয়েটির চরিত্রের সঙ্গে,

তা কেউ তখন ভাবে নি।

অদ্ভুত খাপ খেয়ে গেছে কিন্তু,

বড় বউ সত্যিই অনন্তময়ী।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি,

এই বাড়িতেই কাটল প্রায় পঁচিশ বছর,

কিন্তু কেউ এখনও তাঁর অন্ত পায় নি,

কেউ ধরতে পারে নি তাঁর ঠিক রূপটি কি।

বাইরের রূপ

এখনও যেন ফেটে পড়ছে।

এত বয়সেও লাবণ্য এতটুকু কমে নি।

আরও আশ্চর্য্য,

একই রূপ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়!

যখন পূজোর ঘরে থাকেন,

তখন নিষ্ঠাবতী পূজারিণী;

সেই মানুষই আবার প্রসাধন-কক্ষ থেকে বেরোন যখন,

তখন অভিসারিকা।

আদেশ করেন সম্রাজ্ঞীর মত,

আদেশ পালনও করেন পরিচারিকার মত বিনা বাক্যে।

রেগে গেলে যিনি আগ্নেয়গিরি,

প্রসন্ন হ'লে তিনিই স্বচ্ছসলিল দীর্ঘিকা।

অদ্ভুত অভিনেত্রী!

একই মুখে কমলার কমনীয়তা

এবং চামুণ্ডার বিভীষিকা ফোটাতে পারেন।
সুধামুখী নিমেষে রূপান্তরিত হতে পারে
উল্কামুখীতে।
পেলব পুষ্পহার
কখন যে ভুজঙ্গিনী হয়ে উঠবে,
কেউ বলতে পারে না।
সবাই তাই ভয় করে,
কেবল একজন ছাড়া,
তিনি বড়বাবু।
বড়বাবু বড় বউয়ের দিকে
ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার অবসরই পান নি জীবনে,
চেষ্টাও করেন নি।
বড়বাবু
দিলদরিয়া জমিদারের
দিলদরিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র।
নানা রঙ্গমঞ্চে তাঁর গতায়াত ;
গৃহ-রঙ্গমঞ্চেও যে
প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর আবির্ভাব হতে পারে,
সে খেয়াল করেন নি।
বিয়ে করেছেন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী,
সালঙ্কারা বউকে এনে স্থাপন করেছেন গৃহে—
একটা আসবাব
কিংবা বড় জোর একটা বিগ্রহের মত।
আসবাবের তদারকের

অথবা বিগ্রহের সেবার
যথারীতি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।
একটা আসবাব অথবা বিগ্রহ নিয়ে
উন্মত্ত হয়ে ওঠবার মত
হ্যাংলামি ছিল না তাঁর।
বড়বাবুর পরিচিত বহু নরনারীর মধ্যে
বড় বউও একজন,
তার বেশি আর কিছু নয়।
হয়তো বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারতেন বড় বউ,
প্রসাধন-বৈচিত্র্যময়ী অভিনেত্রীর অন্তরালে
হয়তো সত্যিকারের প্রিয়া একদিন দেখা যেত ;
কিন্তু ঘটনাচক্রে
ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল।
বাইরে মদ খেয়ে
স্ত্রীর ভয়ে এলাচ লবঙ্গ চিবুতে চিবুতে
চোরের মত অন্দর-মহলে ঢোকেন যাঁরা,
বড়বাবু সে জাতের লোক নন।
যথারীতি
ঈষৎ মত্তভাবেই
প্রবেশ করতেন অন্তঃপুরে।
বড় বউ একদিন আপত্তি জানালেন কুঞ্চিত নাসায়।
বড়বাবু বললেন,
দেখ বড় বউ,
তুমি পান দিয়ে দোক্তা খাও, না জরদা খাও,

কুমড়ো-ডাঁটা অথবা পুঁই-ডাঁটা
কোন্‌টা তোমার প্রিয়তর,
কি ধরনের শাড়ির পাড় তোমার পছন্দ,
তোমার গলায়
হার না চিক
কোন্‌টা ঠিক মানায়,
দোতলার জানলা দিয়ে পর-পুরুষের দিকে চেয়ে থাকতে
তোমার ভাল লাগে, কি লাগে না—
এসব নিয়ে কোন দিন তো মাথা ঘামাই নি আমি!
ইচ্ছেই হয় না।
তোমার হঠাৎ এই নীচ প্রবৃত্তি কেন?
I was given to understand,
তুমি আমার সহধর্ম্মিণী।
কোন উত্তর দিলেন না বড় বউ,
চুপ ক'রে ব'সে রইলেন নাসা কুঞ্চিত ক'রে।
বড় বউয়ের নাকের পানে
কিছুক্ষণ ঢুলুঢুলু নয়নে চেয়ে থেকে
বড়বাবু বললেন, অল রাইট।
আর মদ খেয়ে তোমার সমীপস্থ হব না।
যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায়
সমীপস্থ হবার রাইট আছে ব'লেই হব না।
I am a gentleman, madam,
অকারণে একজন লেডির নাসারন্ধ্রকে
বিক্ষুব্ধ করতে চাই না।

তুমি তোমার নানা রকম শাড়ির বাণ্ডিল
আর নানা রকম গয়নার বোঝা নিয়ে
সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর।
সেই দিন থেকে আর মদ খেয়ে
অন্দর-মহলে আসতেন না তিনি।
যখন আসতেন, অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আসতেন,
অবিচলিতভাবে থাকতেন,
অবিচলিতভাবে চ'লে যেতেন।
এবং এই ক'রেই জন্মাল
নীলু দত্তের ভ্রান্ত ধারণাটা।
নীলাম্বর দত্তের বিশ্বাস—
বড়বাবু বাইরে মদ খান
বড় বোয়ের ভয়ে।
হায় রে নীলু দত্ত!
বড়বাবুর খোশামোদ কর বটে তুমি,
কিন্তু বড়বাবুর সমঝদার তুমি নও।
তাই
লাহিড়ীর কাছে বারংবার পরাস্ত হচ্ছ।
বড়বাবুর মদ খাওয়ার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল,—
যখন খেতেন,
তখন একটানা দু-তিন দিন খেতেন,
অর্থাৎ 'সেশন্‌স' চলত।
যখন খেতেন না,
তখন খেতেন না।

বড়বাবু যে ইংরেজী জানেন,
তা বোঝা যেত মদ পেটে পড়লে,
এবং তিনি যে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.,
তা কোন কালেই বোঝা যেত না।
শুধু যে স্ত্রীর প্রতিই তাঁর ঔদাসীন্য ছিল তা নয়,
আত্মীয়স্বজন,
বন্ধুবান্ধব,
জমিদারি, কলিয়ারি,
এমন কি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধেও
তিনি উদাসীন।
পদ্মপত্রের মত তাঁর মনখানি,
কত শিশিরবিন্দুই যে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে!
নতুন জামাই বাঘ শিকার করতে চেয়েছে?
বেশ তো, আসুক।
জয়দ্রথবধ কিংবা অভিমন্যুবধ শোনবার জন্যে
যদি সারারাত্রি শামিয়ানার তলায় কাটানো সম্ভব হয়,
শার্দ্দূলবধ উপলক্ষ্যে
কলমিপুরের মাঠেই বা একরাত্রি কাটাতে আপত্তি কি!
ঢালা হুকুম দিয়েছেন নীলু দত্তকে,
চলুক আয়োজন।
বড় বউ কিন্তু উৎসাহিত হয়েছেন অন্য কারণে,
এবং সে কারণটা
আপাতদৃষ্টিতে এত ছেলেমানুষি,
এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এত নিগূঢ়

যে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে
পণ্ডিত-মহলে হাতাহাতি হবার সম্ভাবনা।
বড় বউ যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন,
তাক লাগিয়ে দিতে চান সকলকে।
এই তাক-লাগানো প্রবৃত্তিটা
তাঁর বংশগত।
যে বাড়ির মেয়ে তিনি,
সে বাড়ির সবাই
একটু উদগ্র রকমের আধুনিক।
দুজন ক্রিশ্চান হয়েছেন, দুজন ব্রাহ্ম,
আত্মহত্যা করেছেন একজন,
বাড়িতে শুধু বিলেত-ফেরত নয়,
জাপান-ফেরত লোকও আছেন।
সেকালের হিসেবে একটু বেশি বয়সেই,
অর্থাৎ পনরো বছরে
বিয়ে হয়েছিল অনন্তময়ীর।
কিন্তু ওই পনরো বছরের মধ্যেই
দাদাদের উৎসাহে,
গৃহশিক্ষকের সহায়তায়,
বাংলা ইংরেজী নভেল নাটক পড়বার বিদ্যেটা
আয়ত্ত করেছিলেন তিনি।
আধুনিক অনাধুনিক
সুপাচ্য দুষ্পাচ্য
নানাবিধ উপ এবং রূপ-ন্যাস

একদা ভারাক্রান্ত করেছিল তাঁর মানসিক পাকস্থলীকে।
উদ্গারের জ্বালায়
আধুনিকমনা দাদারা পর্য্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন।
কণ্ঠস্বর সত্যিই অনিন্দনীয় ছিল।
প্রাক্‌বিবাহযুগে
ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে
তাক লাগিয়ে দিতেন সকলের।
কিন্তু ভাগ্যবিধাতাও
তাক লাগাতে কম ওস্তাদ নন।
এই তন্বী আধুনিকাকে বানিয়ে ছাড়লেন
সনাতনপন্থী জমিদার-বাড়ির বড় বউ।
শরমমন্থর পদক্ষেপে
তীক্ষ্ণভাষিণী রাশভারী শাশুড়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই
জীবনের লক্ষ্য হ'ল।
তিনি যে আধুনিকা,
সেটা এ বাড়িতে গৌরবের বস্তু হ'ল না।
সেটাকে লজ্জায় চাপা দিতে হ'ল ঘোমটার তলায়।
সনাতনী হিন্দুবাড়ির বড় বধূর ভূমিকাতেও
অনন্তময়ী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।
এমন কি,
মাঝে মাঝে ভুলেও যেতেন যে, অভিনয় করছেন।
এই ভাবেই দিন কাটছিল;
স্তরের ওপর স্তর প'ড়ে
অবলুপ্ত ক'রে ফেলেছিল

নিত্যনবায়মানা আধুনিকাকে।
সহসা যৌবনের শেষ প্রান্তে
নিজের কলেজে-পড়া নবোদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের সংস্পর্শে এসে
অন্তঃসলিলা ফল্গু উদ্বেল হয়ে উঠল।
বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জামাই
মেয়েকে নিয়ে শিকারে যেতে চায়!
হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন,
জীবনটা বৃথাই গেছে।
হঠাৎ ঈর্ষা হ'ল—
মেয়ের ওপরই ঈর্ষা হ'ল।
সুরেনের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা কোলের ওপর প'ড়ে ছিল,
স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি,
ভাবছিলেন, যাব, কি যাব না;
হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললেন, যাব, নিশ্চয় যাব,
ওদের তাক লাগিয়ে দিতে হবে।
কলমিপুরের মাঠে
এমন একখানা অভিনয় করতে হবে,
যা শুধু সুরেন-উষাকেই নয়,
বড়বাবুকেও বিস্মিত করবে।
চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন তিনি,
কি করবেন,
কোন্ শাড়িখানা পরবেন!
প্রৌঢ়া বড় বউয়ের পক্ষে এ আচরণ অশোভন?
হয়তো।

উষার বয়স যদিও উনিশ হয়েছে,
শরীরে যৌবন সুপরিস্ফুট,
আই. এ. পাস করেছে,
তবু সে এখনও বালিকা—
ছটফটে, আদুরে, অসংসারী।
দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়,
ঠোঁট তো ফুলেই আছে।
একটু ধমক দিয়ে কথা বললে
এখনও চোখ ছলছল করে মেয়ের।
কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে বলা উচিত,
অপ্রিয় সত্যকে
কি ক'রে একটু ঘুরিয়ে প্রিয় করতে হয়,
কখন চোখ নামানো উচিত,
কাপড় সামলানো উচিত—
কিচ্ছু জানে না।
অত জোরে কথা কওয়া,
অত চেঁচিয়ে হাসা,
অমন দুমদুমিয়ে চলা যে অশোভন,
সে জ্ঞান হয় নি এখনও ভাল ক'রে।
মন প্রস্তুত হবার আগেই
যৌবনটা এসে গেছে দেহে
অকালবসন্তের মত।
দেহটা যত নিটোল হয়েছে,

মনটা তত নিটোল হয় নি,
মনের এখনও অনেক পুরতে বাকি।
মনের গাম্ভীর্য্য আসে নি,
নিগূঢ়তা ঘনায় নি,
গোপনলোক আবিষ্কৃত হয় নি।
যা মনে আসে হাউহাউ ক'রে বলে,
স্বামীর চিঠি সবাইকে দেখায়,
কোন সঙ্কোচ নেই।
কোন কিছু রেখে-ঢেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।
বস্তুত
সে প্রয়োজনই ঘটে নি ওর।
মনের যে পরিণতি হ'লে
মন গোপনতা-বিলাসী হয়,
সে পরিণতিই হয় নি।
ও যদি আর একটু গম্ভীর হ'ত,
তা হ'লে এই ব্যাপার নিয়ে
এমন ক'রে পাড়া গাবিয়ে বেড়াত না।
এই শিকার-অভিযানে
ওই যে কেন্দ্রবর্ত্তিনী,
ওর স্বামীই যে এই অভিযানের নেতা—
তা ও নিজেও ভুলছে না,
কাউকে ভুলতেও দিচ্ছে না।
একমুখ পান খেয়ে
পাড়ায় পাড়ায়

নিজের মনের খুশির ঢাকটা পিটিয়ে বেড়াচ্ছে।
বকবকানির চোটে
সাদা কাপড়ে লেগেছে পানের ছোপ খানিকটা,
সাদা গালেও—
তির্য্যকভাবে,
অসাবধানে ঠোঁট পুঁছতে গিয়ে।

মীনা মেয়েটি,
গাণিতিক নিয়ম অনুসারে,
উষার সমবয়সী।
কিন্তু আসলে মীনা ঢের বেশি বড়।
তার প্রমাণ—
ওর সন্নত দৃষ্টিতে,
মৃদু কথাবার্ত্তায়,
সংযত গমনভঙ্গিমায়।
নিজকে বিজ্ঞাপিত করবার কোন চেষ্টা তো নেইই,
অবলুপ্ত করতে পারলে যেন বাঁচে;
এবং সেইজন্যই সম্ভবত
আরও বেশি করে প্রত্যক্ষ-গোচর।
যখন যেখানে থাকে,
চুপ ক'রেই থাকে,
কিন্তু পূর্ণ ক'রে রাখে সমস্ত স্থানটা।
ওর সসঙ্কোচ মৌনতা
মুখরতম বিজ্ঞাপনের চেয়েও আকর্ষক।

অর্থাৎ
মীনা সত্যিই যুবতী।
রূপসী কি না,
সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে,
আছেও।
বিয়ের বাজারে
জ্যামিতি-পরিমিতিজ্ঞ
যেসব রংরেজ সমঝদারেরা
নাকের মাপ, চোখের পরিধি,
ঠোঁটের স্থূলতা, বর্ণের ঘনত্ব মেপে বেড়ান,
তাঁরা
মীনাকে পাস-মার্কা দেন নি।
পাঁচ-সাত বার
পাঁচ-সাত দল লোক দেখে গেছেন,
কেউ পছন্দ করেন নি।
বিধাতার এই সৃষ্টিটিতে
নানা রকম খুঁত দেখতে পেয়েছেন তাঁরা।
কেরানী, ডাক্তার, উকিল, মাস্টার,
দালাল, দোকানদার,
এমন কি বেকার পাত্রেরও
পাণিপীড়ন করবার সামাজিক অনুমতি
মীনা পায় নি।
মাপ-জোকে অনেক খুঁত ধরা পড়েছে।
রঙ কালো,

চোখ ছোট,

নাক খাঁদা,

চুল কম।

শ্রী ?

ওটা তো মাপা যায় না,

সেইজন্যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তা ছাড়া,

কালো রঙ, ছোট চোখ, খাঁদা নাক, কম চুলকে

অর্থপূর্ণ করতে পারতেন যে অর্থবান পিতা,

তিনিও নেই।

তিনি মীনার বাল্যকালেই মারা গেছেন।

মা লেখাপড়া জানতেন,

তাই

পরের গলগ্রহ হতে হয় নি।

শিক্ষয়িত্রীগিরি ক'রে মানুষ করেছেন মেয়েকে ;

স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন,

বি. এ. পাস করলে

মীনাকেও বাহাল ক'রে নেবেন ইস্কুলে।

এই ভবিষ্য জীবনের অনুপাতেই

নিজেকে প্রস্তুত করছে মীনা।

তার অসংযত আশা

অশোভন মত্ততায়

আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি কখনও।

সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সে সন্তুষ্ট ছিল।

উষার বাড়িতে এসে,
তাদের ঐশ্বর্য্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে
আরও কেমন যেন বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে সে।
সর্ব্বদাই সশঙ্কিত—
পাছে কেউ কিছু মনে করে ;
পাছে কেউ মনে করে,
এ বাড়িতে সে বেমানান আগন্তুক,
এ বাড়ির উঁচু-পর্দ্দায়-বাঁধা চালচলনের সঙ্গে
চলতে পারছে না তাল রেখে ;
পাছে তার অনাভিজাত্য আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে।
তাই,
মনে মনে সশঙ্কিত হয়ে থাকলেও
মীনা বাইরে সপ্রতিভ।
এবং এই সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখবার জন্যেই সে
কৃত্রিম একটা উৎসাহ প্রকাশ করছে
এই শিকার-বিষয়ে।
আসলে সে নির্জ্জনতাপ্রিয়,
ভালবাসে
ঘরের কোণে
চুপ ক'রে একখানা বই নিয়ে প'ড়ে থাকতে।
হৈ-চৈ ভিড় মোটেই ভালবাসে না।
কিন্তু
কেউ যদি মনে মনে ভাবে,
মাস্টারনীর মেয়ে তো হাজার হোক,

এসবের মর্ম্ম ও আর কি বুঝবে !
তাই,
অতিশয় মেকি একটা উৎসাহকে
চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে সে—
মর্ম্মান্তিক বেদনাকে ঢাকবার জন্যে
লোকে যেমন হাসে,
অনেকটা তেমনই ।

অন্তঃপুরের অন্যান্য পরিজনেরা
খুব যে একটা উৎসাহ প্রকাশ করছিলেন তা নয় ;
করবার কথাও নয় ।
বৃদ্ধা পিসীমা হাঁপানি নিয়েই ব্যস্ত,
বুকে পিঠে পুরনো ঘি মালিশ ক'রে
অতি কষ্টে দাওয়ায় এসে বসেন সকালবেলায় ;
পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায় ।

গিন্নীর দূরসম্পর্কের বিধবা বোন-ঝি
প্রাণপণে বৈধব্য পালন করেন,
নিয়মের পান থেকে এতটুকু চুন খসবার জো নেই,
মাথার চুল বেটাছেলের মত ছাঁটা,
নানা ওজুহাতে প্রায়ই উপবাস করেন,
একাদশীর উপবাসটা এমন নিদারুণ রকম নির্জ্জলা যে,
নিষ্ঠীবন পর্য্যন্ত গলা দিয়ে গলতে দেন না,
সারাদিন ব'সে থুতু ফেলেন ।

মাত্র উনত্রিশ বছর বয়স,
কিন্তু কৃচ্ছ্র-ক্লিষ্ট কি কঠোর মুখমণ্ডল!
তিনি এ অভিযানে যোগদান করবেন কি না,
সে প্রশ্নই ওঠে না।

আর একজনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে না,
সে শিবুর মা।
বাড়ির অনেক কালের পুরনো ঝি—
বড়বাবুকে হতে দেখেছে।
সে কক্ষনও কোথাও যায় না।
শনের মত সাদা মাথার চুল
পীতাভ হয়ে এসেছে,
জরার প্রকোপে মুখখানা হয়েছে পোড়া বেগুনের মত,
হাতের লোল চর্ম্মের তলায় দেখা যাচ্ছে মোটা মোটা শিরাগুলো,
মাথা কাঁপে,
গলার স্বরও কাঁপে,
কুঁজো হয়ে গেছে,
দু চোখে পিচুটি ভরা।
শিবুর মা কক্ষনও কোথাও যায় না,
বলে, একেবারে যমের বাড়ি যাব।
যমও কিন্তু ভুলে আছে।
কত লোকের মরণই যে দেখলে শিবুর মা,
আরও হয়তো কত দেখতে হবে!
অদৃষ্টে যা আছে রোধ করবে কে!

কিন্তু সে ভিটে ছেড়ে কোথাও নড়বে না;
সবাই যেখানে যাবার যাক,
শিবুর মা ভিটে আগলে প'ড়ে থাকবে,
আর বকর বকর করবে আপন মনে।

জিতুর মা,
অর্থাৎ দূরসম্পর্কের সেই মাটো ননদটি
যাবে।
হয়তো যেত না,
(বিধবারা আবার শখ ক'রে কোথায় যায় !)
কিন্তু বুড়ো গিন্নীমা যাবেন,
শুদ্ধাচারে তাঁর রান্নাবান্না করবার জন্যে
একজন চাই তো !
আজকাল জিতুর মা-ই সব করে।
মাটো স্বভাবের জন্যে বকুনি খায় সকলের কাছ থেকে,
কিন্তু বেচারী নীরবেই কাজ ক'রে যায়
চুপটি ক'রে
মুখটি বুজে।

জিতুর মা ছাড়া আর যাবে
তিন বউয়ের তিনজন খাস চাকরানী,
আর তিন বাবুর তিনজন খাস চাকর।
চাকরানীদের মধ্যে
লছমনিয়ারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

কারণ তার বয়স সবচেয়ে কম ।
বড় বউ
নিজের বাপের বাড়ি পাটনা থেকে
আনিয়েছেন লছমনিয়াকে ।
ওর স্বামী ভিকুও চাকরি করে এ বাড়িতে,
ছোটবাবুর খানসামা সে ।
লছমনিয়া বেহারিনী,
কিন্তু বাংলা বলে চমৎকার,
এত চমৎকার যে ধরা শক্ত ।
রঙানো ফুলপাড় পাতলা শাড়িটি প'রে
মাথার চুলটি পরিপাটি ক'রে বেঁধে
সর্ব্বদাই ছিমছাম ;
ছিপছিপে চেহারা,
ভারি খরখরি,
দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না ।
ভিকুও যাবে ।
ভিকু বেচারী ভালমানুষ-গোছের লোক,
লছমনিয়ার মত স্ত্রীকে নিয়ে
সর্ব্বদাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়,
লছমনিয়ার সঙ্গে জোড় মেলে নি ।
কিন্তু আপাতদৃষ্টিটাই কি সব ?
সব যবনিকাই কি সুভেদ্য ?

মেজমার চাকরানী কাদম্বিনী—
সংক্ষেপে কাদু,
এই গ্রামেরই মেয়ে।
চার-পাঁচ ছেলের মা,
ভারিক্কি চেহারা।
হাতে কপালে উল্কি,
বাহুমূলে থলথল করছে চর্ব্বি,
সর্ব্বদাই একমুখ হাসি,
ভারি মিষ্টভাষিণী।
প্রত্যহ
প্রকাণ্ড গামলায় ক'রে ভাত,
এক জামবাটি ডাল,
তদুপযুক্ত তরকারি নিয়ে
সে বাড়ি যায় দুপুরে
ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে।
স্বামীটিও অকর্ম্মণ্য,
এককালে গাড়োয়ানি ক'রে কিছু উপার্জ্জন করত,
কিছুদিন থেকে বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছে।
মেজ মার দাক্ষিণ্যেই সংসার চলছে।
মেজ মার সঙ্গে যেতে হবে শুনে
কাদম্বিনীর চিন্তা হ'ল,
ছেলেমেয়েদের আর স্বামীকে দেখবে কে!
মেজ মা বললেন,
তার ব্যবস্থা করবেন তিনি মেজবাবুকে ব'লে।

করলেনও।

মেজবাবু ছোটবাবুকে বলেছেন

এবং ছোটবাবু আদেশ করেছেন নীলু দত্তকে।

ছোটবাবুর আদেশ শুনে

নীলু দত্তের মনে হ'ল,

আঃ, ফ্যাসাদ এক রকম!

বাইরে অবশ্য অন্য ভাব দেখালেন,

কুঞ্চিত কপাল থেকে ঘামটা মুছে ফেলে বললেন,

ওর জন্যে আর ভাবনা কি,

এক্ষুনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

ব'লে দিলেন অতিথিশালার পাচককে,

কাদম্বিনীর বাড়িতে যেন রোজ ভাত দিয়ে আসা হয়।

তবু কাদম্বিনীর মন খুঁতখুঁত করছে—

কোলের ছোট ছেলেটা কি ছেড়ে থাকতে পারবে?

অত দূরে টেঙিয়ে টেঙিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো মুশকিল।

বড় মেয়ে সদুর কাছেই রেখে যেতে হবে,

তা ছাড়া আর উপায় কি!

তরঙ্গিণীর চাকরানী কালীর মা।

বিধবা,

কৈবর্ত্তের মেয়ে।

বিধবা ব'লেই যে শ্রীহীন তা নয়,

গড়নই ওই রকম।

লম্বা শুকনো কাঠ-কাঠ চেহারা,

সর্ব্বাঙ্গে
মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি,
চক্ষু কোটরগত,
হাসলে দাঁতের চেয়ে বেশি দেখা যায় মাড়ি।
কালীর মাকে দেখে
চেষ্টা ক'রেও মুগ্ধ হওয়া শক্ত।
কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে
তরঙ্গিণীর অন্তরঙ্গিণী।
তার কারণ
সে চমৎকার ঘর পুঁছতে পারে,
চমৎকার সাবান কাচে,
পরিষ্কার বাসন মাজে,
বিছানা করে পরিপাটিরূপে—
একটু কোথাও কুঁচকে থাকে না,
টেবিল, দেরাজ, আয়নায় জমতে দেয় না ধূলো।
কালীর মার কল্যাণে
তরঙ্গিণীর ঘরদোর, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন
তকতকে, ধপধপে, ঝকঝকে।
অথচ মুখে রাটি নেই ;
চুরি করে না,
হাতে তুলে যা দাও তাতেই সন্তুষ্ট।
ভগবান রূপের অভাব পূর্ণ করেছেন গুণ দিয়ে।
শিকারে যাবার কথা শুনে
সে আনন্দিত হ'ল, কি দুঃখিত হ'ল, কি বিস্মিত হ'ল,

কিচ্ছু বোঝা গেল না।
কারণ, কথা সে বড় একটা বলে না,
মুখও তার ব্যঞ্জনাবিহীন।

বড়বাবুর খানসামা নীলমণিও নির্বিকার।
বড়বাবুর সঙ্গে সে এত জায়গায় ঘুরেছে
এবং এত জিনিস দেখেছে যে,
এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা
সে আত্মমর্য্যাদাহানিকর ব'লেই মনে করে।
নীলমণির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,
রঙটি কালো,
জুলপির চুলগুলিতে পাক ধরেছে,
গোঁফও কাঁচাপাকা।
গায়ে পরিষ্কার সাদা ফতুয়া,
কাঁধে একটি ঝাড়ন।
চোখ-মুখে
বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট, কিন্তু নীরব।
সব জানে, সব বোঝে,
কিছু বলে না।
অকারণে অনাবশ্যকভাবে
কখনও প্রকট করে না নিজেকে,
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কথা বলে না
এবং প্রাণ গেলেও এমন কিছু করে না,
যা বড়বাবুর বিরক্তিকর।

বড়বাবু বাইরে যাবেন শুনে
সে নির্ব্বিকারভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

মেজবাবুর খানসামা বিশ্বম্ভর
একটু রুদ্রপ্রকৃতির লোক,
কথায় কথায় লোকের মাথা ফাটাতে উদ্যত হয়।
মেজবাবু সর্ব্বদাই তাকে সামলে চলেন।
মেজবাবুর ভাবটা অনেকটা এই রকম—
পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই প্রহারযোগ্য তা জানি,
তুমি যা বলছ তা ঠিকই,
কিন্তু শান্তিতে বাস করাও তো দরকার!
ছুঁচো কি এক-আধটা যে, মেরে শেষ করবে!
কাঁহাতক হাত গন্ধ করবে তুমি,
চ'লে এস।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে,
ওই একটি মস্ত গুণ তার।
শিকারের কথা শুনে
সে সর্ব্বাগ্রে
তার তৈলপক্ক বাঁশের বেঁটে মোটা লাঠিটা পেড়ে
তেল মাখাতে লাগল তাতে।

মেজবাবু লোকটিও শোনা যায়,
যৌবনকালে পরাক্রান্ত ছিলেন।
খুব হাত চলত,

প্রায়ই লেগে থাকত একটা না একটা ফৌজদারি।
শায়েস্তা করতেন
বড় বড় দুরন্ত ঘোড়া, পাগলা হাতী।
সময় কাটত কুস্তির আখড়ায়।
কিন্তু হঠাৎ একবার পদস্খলিত হয়ে
কেমন যেন মুষড়ে গেছেন।
দুরারোগ্য প্রমেহ ব্যাধিতে,
শারীরিক যতটা না হোক,
মানসিক প্রাবল্যটা লোপ পেয়েছে।
বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা—
শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যক্তি,
নিতান্ত ভালমানুষটি হয়ে গেছেন আজকাল।
নিজের সমস্ত দুষ্কৃতির কথা অকপটে স্বীকার ক'রে
মেজ মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন মেজবাবু,
এবং তাঁরই স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়
বাস করছেন নির্ব্বিরোধে।
এই শিকার ব্যপদেশে উৎসাহিত হয়েছেন
মেজ মারই উৎসাহে,
সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত চন্দ্রের মতন।

ছোটবাবু কিন্তু
এখনও আছেন বেশ জবরদস্ত।
বড়বাবু খামখেয়ালী উদাসীন,
মেজবাবু নির্ব্বাপিত,

ছোটবাবুই আসলে জমিদার।
দাদাদের মতন বিরাটকায় নন যদিও,
কিন্তু চেহারাটা তাঁর চেয়ে দেখবার মত।
ধপধপে রঙ,
কস্‌মেটিক-লাগানো সূচ্যগ্র কালো কুচকুচে গোঁফ,
চওড়া ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ,
আরক্ত আয়ত চক্ষু দুটি
শ্রী ও শালীনতায় জলজল করছে।
অধরে চিবুকে
শক্তি ও সংযমের সমন্বয়।
সমস্ত মুখমণ্ডলে
অভিজাতসুলভ দর্প প্রদীপ্ত অথচ প্রচ্ছন্ন।
ছোটবাবুকে কেন্দ্র ক'রে
হিরণপুর গ্রামে
নানা গুজব আবর্ত্তিত হয় নানা রসনায়।
চিরকালই হবে।
কারণ,
এমন একটা কন্দর্পকান্তি জমিদারপুত্র
নিষ্কলঙ্কচরিত্র—
বিশ্বাস করা কঠিন।
সুতরাং
কল্পনাকুশল বহু 'প্রত্যক্ষদর্শী'
বহু রকম কাহিনী বিবৃত করেন গোপনে গোপনে।
ভয়ও করেন সকলে ছোটবাবুকে,

চেহারাটা দেখলেই মনে হয় কড়া মেজাজের লোক।
আসলে কিন্তু
অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক তিনি।
দাদাদের পুরোভাগে রেখে
তিনি পরিচালনা করেন সমস্ত।
প্রাচীন ম্যানেজার সীতানাথবাবু
(প্রশস্ত টাক, পাকা ভুরু)
নির্ভরযোগ্য একজন মনিব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।
নায়েব চৌধুরী
কিন্তু খুশি হন নি মোটেই।
ছোটবাবু যতদিন
লেখাপড়া নিয়ে ছিলেন কলকাতায়,
ততদিন মান-খাতির ছিল চৌধুরীর।
দিলদরিয়া বড়বাবু,
শিবতুল্য মেজবাবু
কখনও চৌধুরীর কথার ওপর কথা কন নি ;
চৌধুরী যা করতেন তাই হ'ত,
সীতানাথবাবুও মানতেন তাঁর কথা।
কিন্তু ছোটবাবু আসাতে
বদলে গেল সব।
ছোটবাবু নিজেই মহালে মহালে ঘোরেন,
প্রজাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন,
বিচার-ব্যবস্থা করেন ;
সীতানাথবাবুও

অবস্থা বুঝে সায় দেন তাতে।
চৌধুরী হয়ে পড়েছেন কেরানী মাত্র।
তাই
হরিদ্বার-ফেরত কুঞ্জলালের দল
যখন চৌধুরীকে গিয়ে ধরলে,
আমরাও শিকারে যাব নায়েব মশাই ;
চৌধুরী বললেন,
আমি কিছু জানি না ভাই,
যাও ছোটবাবুর কাছে।
আজকাল আমাদের কথার মূল্য নেই,
তাই
নিজেদের মান বাঁচাবার জন্যে
কোন কথাতেই থাকি না আমরা।
কুঞ্জলাল বললে,
ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে বললে কেমন হয় ?
চৌধুরী ঈষদুষ্ণ হলেন,
একটু মুখবিকৃতি ক'রে পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটা,
ম্যানেজারবাবুকে বললে কি হয় !
যা বললাম, তাই করগে যাও।
ম্যানেজারবাবু নেইও এখানে,
দিনাজপুরে গেছেন সাক্ষী দিতে।
থাকলেও—হুঁঃ—!
সম্পূর্ণ করলেন না তিনি কথাটা,
তবে বোঝা গেল স্পষ্ট,

স্বয়ং চৌধুরীই যখন অপারক,
তখন ম্যানেজার থাকলেই বা কি করতেন!
কুঞ্জলাল গেল অবশেষে ছোটবাবুর কাছেই,
একটু ভয়ে ভয়ে।
নিশ্ছিদ্র চরিত্রের লোককে সবাই ভয় করে।
ছোটবাবু কিন্তু খুশি হলেন।
বললেন, নিশ্চয়, যাবে বইকি।
হরিদ্বার থেকে ফিরলে কবে সব?
আজ সকালে।
কজন আছ তোমরা?
জন পাঁচেক—
হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু আর আমি।
বেশ, যেও সব,
কাল ভোরেই আমরা বেরুব—
ভোর চারটেয়।
জামাই আজ রাত্রেই এসে পৌঁছবে।
কিন্তু হাতীতে তো কুলোবে না সকলের।
তোমরা—।
একটু ইতস্তত করতে লাগলেন ছোটবাবু।
কুঞ্জলাল বললে,
আমরা গরুর গাড়িতেই যাব সবাই,
হেঁটেও যাব খানিকটা।
বেশ, তা হ'লে তো কথাই নেই।
হৃষ্ট কুঞ্জলাল ছুটল খবর দিতে।

হাবুল, পাঁচু, বীরেন, বঙ্কু এবং কুঞ্জলাল
সেই বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত,
যা বাংলা দেশে বেকার নামে প্রখ্যাত।
টাকা রোজকার করতে পারে না যদিও,
কিন্তু নির্গুণ নয়।
মাথায় বাবরি,
শ্যামবর্ণ, বেঁটে কুঞ্জলাল
ওস্তাদ বংশীবাদক।
শুধু তাই নয়,
গ্রামের অ্যামেচার থিয়েটার-পার্টিটির
ওই আত্মাস্বরূপ।
নানা অসুবিধার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে থিয়েটারটিকে।
জমিদারবাবুরা সেইজন্যেই বিশেষ ক'রে
স্নেহ করেন কুঞ্জলালকে।

বঙ্কুর হাসাবার ক্ষমতা আছে,
অর্থাৎ লোকে বঙ্কুকে দেখলেই হাসে।
চলিত ভাষায় যাকে বলে গন্না-কাটা, বঙ্কু তাই।
ইংরেজীতে বলে 'হেয়ার-লিপ'।
অর্থাৎ খরগোশের মতন
ওপর-ঠোঁটের মাঝামাঝি
নাকের নীচেই খানিকটা নেই,
এবং সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে
হলদে রঙের গোটা দুই দাঁত।

তালুতেও নাকি একটা ছিদ্র আছে,
চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হয়ে পড়ে তাই কথাগুলো।
বন্ধুদের মনে হাস্যরস সৃষ্টি করবার পক্ষে
বিধাতার এই কারুকার্য্যটুকুই তো যথেষ্ট ছিল,
এর ওপর বঙ্কু কেন যে
ছাগলের মত খানিকটা দাড়ি
এবং কুৎসিত এক জোড়া গোঁফ রেখেছে,
তা বঙ্কুই জানে।
বঙ্কু পারতপক্ষে কথা বলে না, হাসে না,
কোথাও যেতে চায় না,
কিন্তু বন্ধুদের দল নাছোড়।
তারা যেখানে যাবে, বঙ্কুকে টেনে নিয়ে যাবেই
এবং চেষ্টা করবে চটিয়ে দিতে।
চ'টে গেলে বঙ্কু নাকি মূর্ত্তিমান হাস্যরস হয়ে ওঠে।

হাবুলের নানা খ্যাতি।
স্বাস্থ্যবান সুন্দর যুবক।
ভাল গোল বাঁচাতে পারে,
ফিমেল পার্ট করতে পারে,
পরিবেশন করতে পারে,
মড়া পোড়াতে পারে,
আরও অনেক কিছু পারে।
কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যটি করবার সময়
এমন একটা 'তেরিয়া' ভাব নিয়ে থাকে,

সাদা বাংলায় যার অর্থ—
বেশি ঘাঁটিও না আমায়,
ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।
ছুটো মিষ্টি কথা ব'লে
কাজ আদায় করতে হয় তার কাছে থেকে।

বীরেন হচ্ছে এদের মধ্যে কৃতবিদ্য।
বি. এ. পাস,
নানা রকম খবর জানে,
রাখে,
বিতরণ করে।
গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর নিগূঢ় কারণ কি,
জ্যানেট গেনারের বয়স কত,
আগামী বারে কে মেয়র হবে,
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে কে কত রান করলে,
শরৎবাবু 'প্রবাসী'তে কেন লিখতেন না,
আধুনিক কোন্ লেখকের কি কি দোষ,
রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা কেমন,
জাপানীরা জিনিস সস্তা করে কি উপায়ে,
ডি. ভ্যালেরা, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইসাডোরা ডান্কান,
মারোয়াড়ীদের পলিসি,
পি. সি. রায়ের উদ্দেশ্য,
হরিজন,
সাফ্রাজেট্স,

কো-এডুকেশন,
শিশির ভাদুড়ী—
বীরেনের জ্ঞান-ভাণ্ডারও যেমন অফুরন্ত,
শ্রোতাদের ধৈর্য্যও তেমনই অফুরন্ত।
বীরেন অবশ্য ঠিক এ দলের উপযুক্ত নয়,
ওর পালক ভিন্ন জাতের।
কিন্তু যতদিন একটা চাকরি না জুটছে
এবং উদারতর আকাশে না পাখা মেলতে পারছে,
ততদিন বক-সমাজেই বাস করতে হচ্ছে হংসকে।

পাঁচু বেচারার প্রদর্শন করবার মত
কোন গুণ নেই যদিও,
কিন্তু ওকে ছাড়া চলবার উপায় নেই।
ইংরেজীতে যাকে বলে—ইউস্‌ফুল।
বিছানা বাঁধতে বল,
গাড়ি ডাকতে বল,
রাত দুপুরে বিড়ি কিনে আনতে বল,
মশারি খাটাতে বল,
এমন কি পা টিপে দিতে বল,
সবেতেই রাজি।
ফাইফরমাশ খাটতে অদ্বিতীয়,
হাসিমুখে
নির্ব্বিচারে
সব করবে।

অর্থাৎ
পাঁচু অলঙ্কার নয়,
অপরিহার্য্য।
কিন্তু বঙ্কুর ও মহাশক্র।
কাকের পিছনে ফিঙের মতন
সর্ব্বদাই লেগে আছে।

জমিদার-বাড়ির এই মৃগয়া-অভিযানে
যোগদান করতে পেয়ে
উৎফুল্ল হ'ল সবাই।
হরিদ্বারের রেশটা কাটতে না কাটতেই
বাঘ শিকার!
কলমিপুরের মাঠে যেতে হবে!
দূর ব'লেই মজাটা আরও বেশি।
কলমিপুরের মাঠ কি এখানে?
হিরণপুর ছাড়িয়ে নতুনগঞ্জ,
তারপর চাটুজ্জেদের হাট,
চাটুজ্জেদের হাট পেরিয়ে রতনদীঘি,
রতনদীঘির পর বাতাসপুর
(বিখ্যাত গুড়ের পাটালি হয় যেখানে),
বাতাসপুর ছাড়িয়ে আর একটু গেলেই
বিখ্যাত জলুঙ্কর বিল।
সেই বিলের ধার দিয়ে দিয়ে
প্রায় ক্রোশখানেক যাবার পর

কালভৈরবের মাঠ
(এককালে মানুষ ঠেঙিয়ে মারত নাকি সেখানে),
মাঠটাও ক্রোশখানেক।
মাঠ পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই
ঘেঁষাঘেঁষি তিনটে গ্রাম।—
প্রথমে নালতে,
নালতের গায়েই শঙ্করা
(বাবুদের একটা কাছারি আছে সেখানে),
তারপর ছাতিমপুর।
ছাতিমপুর ছাড়িয়েই কাঁকন নদীটা,
এখন অবশ্য শুকিয়ে গেছে,
বর্ষাকলে কাঁকন কিন্তু খরস্রোতা।
কাঁকনের পর রাজহাট,
তারপর তপসেডাঙা,
তপসেডাঙার পর কলমিপুর।
কলমিপুর আমের কলমের জন্য বিখ্যাত,
আশেপাশে কেবল আমবাগান।
কলমিপুর গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে
একটা শালবন।
শালবনের ওধারে কলমিপুরের মাঠ,
মাঠের ওপাশ দিয়ে ব'য়ে গেছে ময়না নদী,
নদীর ওপারে আবার বন,
সেই বনে এসেছে বাঘ।

পথে

১

নীলু দত্ত কাজের লোক। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মতে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। শেষ মুহূর্ত্তে অকূল পাথারে পড়িয়া হাঁসফাঁস করে বেকুবেরা। ওই তেপান্তর মাঠে এতগুলি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চাহিদা মিটাইতে হইলে সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্ণেই না করিলে চলে? সুতরাং শুধু ত্র্যহস্পর্শের ভয়েই নয়, দায়িত্বের তাড়াতেই এবং লাহিড়ী-সম্পর্কিত খুঁতখুঁতানি সত্ত্বেও দত্ত মহাশয় পনরোখানা গরুর গাড়িতে তাঁবু প্রভৃতি আসবাবপত্র বোঝাই করিয়া সাইক্ল্ সহযোগে আগের দিনই রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাকি দশখানা গাড়ি আজ যাইতেছে।

এই গাড়িগুলিতে অল্পস্বল্প জিনিসপত্র আছে, লোকজনও আছে। বাড়ির চাকর-চাকরানীরা, হরু মণ্ডল, তিমু চাটুজ্জে, তালুকদার মশাই, হরিশ খুড়ো, রোগা নিতাই, গোহুম্নি, কুঞ্জলালের দল—সকলেই গরুর গাড়িতে চলিয়াছে। হাতী, পালকি, ঘোড়া আগাইয়া গিয়াছে। অগ্রবর্ত্তী গাড়িটি বিরিঞ্চির। সে গাড়িতে গোহুম্নি ছাড়া আর কেহ নাই, বিরিঞ্চি আর কাহাকেও বসিতে দেয় নাই। গোহুম্নি আপন মনে বসিয়া চিনাবাদাম-ভাজা ছাড়াইয়া খাইতেছে এবং স্মিতমুখে বিরিঞ্চির আবোল-তাবোল শুনিয়া যাইতেছে। নূতন কেনা নীল রঙের শাড়িখানিতে চমৎকার মানাইয়াছে তাহাকে।

দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন স্থূলকায় তিমু এবং রোগা নিতাই। এরূপ বেমানান যোগাযোগের কারণ উভয়েই স্বজাতি এবং তাম্রকূটবিলাসী।

স্বভাবেরও খানিকটা মিল আছে। নিতাই কৃশতা সত্ত্বেও বীরত্বাভিমানী, তিনু স্থূলতা সত্ত্বেও ক্ষিপ্রতাবিলাসী। তিনু কখনও মন্থর গজেন্দ্রগমনে হাঁটেন না, হনহন করিয়া হাঁটাই তাঁহার রীতি। সামনে ছোটখাটো নালা নর্দ্দমা দেখিলে লাফাইয়া পার হইবার চেষ্টা করেন, আমগাছের নীচু ডালের দোদুল্যমান আমটা লাফাইয়া না পাড়িতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে মোটা বলিয়া অকেজো, এ কথা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিবার অবকাশ তিনি কাহাকেও দিতে চান না। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করার পর হইতে তাঁহার চটপটে ভাবটা আরও যেন একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাই হুঁকাটিতে দীর্ঘ শেষ টানটি দিয়া তাহার মুখটি মুছিয়া তিনুর হাতে দিল।

আছে কিছু অবশিষ্ট ?

দেখই না টেনে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনু টান দিলেন। বেশ ধোঁয়া বাহির হইল। ভ্রূ পুনরায় মসৃণ হইয়া গেল, তিনি প্রসন্ন চিত্তে টানিতে লাগিলেন। নিতাই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের এক কোণে স্তূপীকৃত ধোনা তুলার মত বিরাট একটা স্তূপ মেঘ পড়িয়া আছে। একটা শকুনি বহু ঊর্দ্ধে চক্রাকারে উড়িতেছে।

তৃতীয় গাড়িতে ছিলেন গাদা-বন্দুক-হস্তে তালুকদার মশাই এবং তাঁহার বন্ধু হরিশ খুড়ো। হরিশ খুড়োর গল্প শুনিতে রাজি হইলেই হরিশ খুড়োর সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া যায়। তালুকদার তাঁহার গল্প-শুনিয়ে বন্ধু। এমন মনোযোগী শ্রোতা হিরণপুরে দুর্লভ। এখনি যদিও তালুকদার ঠিক মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি খুড়ো নিরস্ত হন নাই। খুড়ো কল্পনাবান ব্যক্তি। এতক্ষণ নানারূপ বাঘের ভীষণ

রূপ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন যে, যেন তিনি বহু বাঘ বহুবার ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, গাদা বন্দুকই ব্যাঘ্র-শিকারের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র।

তালুকদারের দৃষ্টি কিন্তু চতুর্থ গাড়িতে নিবদ্ধ।

খুড়ো বলিতেছিলেন, রাইফেল-মাইফেল অনেক রকম বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তোমার ও অস্তরের কাছে কেউ লাগে না। বনেদী ক্ষীরের কাছে কন্‌ডেনস্‌ড মিল্ক লাগে কখনও? দাও, একটা বিড়ি দাও।

চতুর্থ গাড়িতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই তালুকদার হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত চালাইয়া বিড়ির কৌটাটি বাহির করিলেন। খুড়োকে একটি দিলেন, নিজেও ধরাইলেন।

তালুকদারের অঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত খাপ না খাইলেও যে পোশাক তিনি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা শিকারেরই উপযোগী। কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট, খাকী রঙের হাফশার্ট, বাদামী রঙের বুট। তালুক-দারের গলাটা একটু অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও ছিনে বলিয়া শোলার হ্যাটটা তেমন মানায় নাই। তা না মানাক, রোদ ঠিক আটকাইতেছিল। বিড়িটি ধরাইয়া তালুকদার পুনরায় চতুর্থ গাড়ির দিকে চাহিলেন।

চতুর্থ গাড়িতে ছিল লছমনিয়া, কাদম্বিনী, কালীর মা। ভিকুও এই গাড়িটার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া আসিতেছিল। প্রায় শেষের দিকের একখানা গাড়িতে নীলমণি ও বিশ্বম্ভরের সহিত বসিয়া সে কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিল না। অত দূরে কি থাকা যায়!

তালুকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লছমনিয়া মুচকি হাসিয়া কাদম্বিনীর কানে কানে কি যেন বলিল।

কাদম্বিনী ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল, বউ ম'রে গিয়ে অবধি হ্যাংলা হয়ে উঠেছে মুখপোড়া।

কালীর মা একবার লছমনিয়া এবং একবার তালুকদারের মুখের পানে চাহিল। তাহার মনে কোন ঈর্ষা ঘনাইয়া উঠিল কি না, বোঝা শক্ত। কারণ মনের ভাব মুখে প্রতিফলিত হইবার মত মুখ তাহার নয়। তবু অকারণে সে তাহার থান-কাপড়ের ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া গায়ে কাপড়-চোপড় টানিয়া সরিয়া বসিল।

পঞ্চম গাড়ি জিনিসপত্রে বোঝাই।

ষষ্ঠ গাড়িতে ছিল গোটা দুই বিছানার বাণ্ডিল, এবং তাহার উপর বসিয়া ছিল হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে। হরুর মাথায় লাল শালুর প্রকাণ্ড পাগড়ি, দেহ অনাবৃত। তাহার ক্ষীণ কটি, পেশীসমৃদ্ধ উরস্ সত্যই দেখিবার মত বস্তু। পরনের কাপড়খানি পরিষ্কার এবং বেশ আঁটসাঁট করিয়া পরা। দক্ষিণ বাহুতে একটা মোটা রূপার তাগা। পাকা পুষ্ট গোঁফজোড়াতে তা দিতে দিতে হরু মণ্ডল গাড়োয়ান রহমনের সহিত চাষবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, আর এক পসলা বৃষ্টি না হ'লে তো সব গেল হে রহমন!

সে কথা আর বলতে!—রহমন গরু দুইটির পেটের তলায় পা চালাইয়া দিয়া হরু মণ্ডলের মুখের পানে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

হরু মণ্ডল তাহার সে হাসি দেখিতে পাইল না। সে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। রৌদ্রের প্রখর তাপে মাটি যেন ফাটিয়া যাইতেছে। সহসা একটা ছোট মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল, চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ ছায়ায় ভরিয়া উঠিল।

সপ্তম গাড়িও জিনিসপত্রে ভর্ত্তি।

অষ্টম গাড়িতে ছিল নীলমণি ও বিশ্বম্ভর।

আপন আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নীলমণি সম্ভবত চুপ করিয়া এক ধারে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। চোখ খুলিয়া থাকিলেই বিশ্বম্ভরটার

সহিত বকর-বকর করিতে হইবে। ঘুমের ভান করাই ভাল। তাহা ছাড়া এক চটকা যদি ঘুমাইয়া লইতে পারা যায়, লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কলমিপুরের মাঠে বড়বাবু সারারাত যে কি কাণ্ড করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। হয়তো সারারাত ঘুমানোই যাইবে না।

বিশ্বম্ভর গাড়োয়ানটার সহিত বচসা বাধাইবার চেষ্টায় ছিল।—তখুনি বললাম তোমাকে, এগিয়ে নাও গাড়িখানা! ধুলো খেতে খেতে চলতে হবে এখন সারা পথটা! যেমন গরু, তেমনই গাড়োয়ান! গরুগুলোকে খেতে-টেতে দাও কিছু, না খাটিয়েই চলেছ কেবল দিন-রাত?

দীনু গাড়োয়ান খুব ঠাণ্ডা-প্রকৃতির লোক। অতিশয় নরম কণ্ঠেই জবাব দিল, খেতে দিই বইকি।

বিশ্বম্ভর উষ্ণতর কণ্ঠে বলিল, খেতে দাও! মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাও নি তুমি? খেতে দিলে গরুর অমন পাঁজরা বেরোয়?

দীনু কোন জবাব দিল না। কারণ বিশ্বম্ভরকে সে চিনিত। এবং নীলমণি দীনুকে চিনিত বলিয়া বিশ্বম্ভরকে লইয়া দীনুর গাড়িটাতেই চড়িয়াছে। নীলমণি এক ধারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া সব শুনিতেছিল।

শেষ গাড়ি দুইখানা অধিকার করিয়া ছিল কুঞ্জলালের দল।

বীরেন নানা অসুবিধার মধ্যেও আগের দিনের খবরের কাগজ-খানা পড়িতেছিল। খবরের কাগজ না পড়িলে তাহার চলে না। গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে সে চেকোস্লোভাকিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিল।

কুঞ্জ বাজাইতেছিল বাঁশী।

সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক ছায়াময়। পথে একটা বুড়ী গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারের একটা গাছ হইতে হলুদ রঙের সুন্দর

একটা পাখি উড়িয়া গিয়া মাঠের ঘনপত্রাচ্ছাদিত একটা গাছের ভিতর আত্মগোপন করিল।

হাবুল বলিল, কি সুন্দর একটা হলদে পাখি উড়ে গেল, দেখলি?

কি পাখি বল্ তো ওটা?

বীরেন পাখিটা দেখে নাই; তবু বলিল, দোয়েল।

পাঁচু বলিল, কই, আমি দেখতে পেলাম না তো!

হাবুল হাসিয়া জবাব দিল, তুই বঙ্কুর পানে চেয়েই তন্ময় হয়ে আছিস, অন্য কিছু দেখবার আর কি অবসর আছে তোর?

পাঁচু বঙ্কুর দিকে চাহিয়া বলিল, মাইরি বঙ্কু, তোকে দেখে পদ্য লিখতে ইচ্ছে করছে—

বঙ্কুবিহারী চলিয়াছে চাপিয়া গরুর গাড়ি,
ফুরফুরে হাওয়াতে উড়িতেছে ছাগল-দাড়ি।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইয়া বলিল, দাড়ি কত রকমের আছে জানিস? হিন্দীতে ভারি চমৎকার একটা শ্লোক আছে দাড়ির।

কুঞ্জর মামা মজঃফরপুরে চাকরি করেন। কুঞ্জ সেখানে কিছুদিন ছিলও। সুতরাং তাহার কথার মূল্য আছে।

হাবুল বলিল, কি শ্লোক, শুনি না।

কুঞ্জ বলিল, এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্কো,
এক দাড়ি মন্‌মহেশ, এক দাড়ি বভ্‌ভো।

এর মানে?

মানে তো সোজা। চুটুক পুটুক মানে ছিটেফোঁটা, এখানে একগাছা ওখানে একগাছা। তক্কো মানে ছোট্ট ছাগল-দাড়ি, যেমন আমাদের বঙ্কুর। মন্‌মহেশ হচ্ছে—বেশ গাল-ভরা ঘন-দাড়ি, কিন্তু বে-একার নয়। আর বভ্‌ভো হচ্ছে একেবারে—

কুঞ্জ ঠিক উপযুক্ত কথাটা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

বীরেন খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বলিল, এপিক ব্যাপার, অর্থাৎ আ-নাভি।

ঠিক বলেছিস। গোঁফেরও একটা শ্লোক আছে—

দই চপচপ কেলা মোচা
ভঁইসা শিঙ্গা উপর খোঁচা
মধ্যে শূন্য নেয়াপাতি
পাঁচটি প্রকার গোঁফের জাতি।

কুঞ্জ এই শ্লোকটিরও হয়তো বিশদ ব্যাখ্যা করিত, কিন্তু পাঁচুর জ্বালায় হইল না।

সে বলিয়া বসিল, আমার আবার একটা মিল মনে এসেছে।—

হে বঙ্কু চক্কো, দাড়ি তব তক্কো।

বঙ্কু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে, কিছুতে চটিবে না। তবু তাহার উপরের অসম্পূর্ণ ঠোঁটটা একটু কুঞ্চিত হইল এবং তাহা দেখিয়া হাবুল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন খবরের কাগজের একখানা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ওহে, আবার একটা মেয়ে লেকে ডুবেছে।

হাবুল বলিল, এবার কলকাতায় গেলে লেকের জল খানিকটা নিয়ে আসব মাইরি বোতলে পুরে। আমাদের পাড়ার মন্টিটার মাঝে মাঝে ফিট হয়, লেকের জল মাথায় ছিটোলে হয়তো সেরে যেতে পারে।

বীরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, জলে অ্যামোনিয়ার যতটা কন্সেন্‌ট্রেশন হ'লে ফিট ছাড়ে, লেকের জলে ততটা এখনও হয় নি বোধ হয়। মড়া পচবার তো আর অবসর দিচ্ছে না, তুলে ফেলছে কিংবা ভেসে উঠছে।

হাবুল কৌতুকটার রাসায়নিক অংশটা ঠিক ধরিতে পারিল না। তবু বলিল, যতটা হয়েছে তাই যথেষ্ট।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উদ্দি-টুদ্দি পরিয়া জগদেও পাঁড়ে ও কিশোর সিং সকলের পিছনে লাঠি কাঁধে করিয়া আসিতেছিল। উভয়ে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, ঠিক শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু তরুণ যুবক কিশোর সিংয়ের সমস্ত মুখে একটা সশ্রদ্ধ অবহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেন কোন তরুণ ছাত্র প্রবীণ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছে।

সহসা পিছনের গাড়ির গাড়োয়ানটাকে লক্ষ্য করিয়া জগদেও পাঁড়ে আদেশ করিল, গাড়ি বাঁয়ে করো। যানে দো ই লোককো।

কতকগুলি সাঁওতাল ও সাঁওতাল-রমণী যাইতেছিল। একজন সাঁওতালের কাঁধে একটা বাঁক। বাঁকের এক ধারে একটা চুপড়িতে জিনিসপত্র এবং অন্য ধারে একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি বেশ নির্ভয়ে বাঁকে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে।

হাবুল কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। দুইটা সাঁওতাল-মেয়ে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আগাইয়া গেল।

বীরেনের হঠাৎ মনে পড়িল, বাদল ডাক্তারকে তো দেখা যাইতেছে না! সে কি তাহা হইলে—

বীরেন কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু কি হাতীতে গেছেন?

জগদেও প্রথমে হিন্দীতেই বলিল, ডাক্‌টারবাবু ফটফটিয়ামে সওয়ার হো কর বাতাসপুর গয়ে হেঁ রোগী দেখনেকে লিয়ে। তাহার পর কি মনে করিয়া বাংলাতে বক্তব্যটা শেষ করিল, সেইখানসে হামাদের সং লিবেন।

বীরেন এই বার্ত্তায় খুশি হইল। সে গরুর গাড়িতে যাইতেছে, অথচ ডাক্তারবাবু হাতীতে গিয়াছেন—এ বার্ত্তা বীরেনের পক্ষে কষ্টকর হইত। তাহার অপেক্ষা অনেক ছোট এক মাসতুতো ভাইয়ের সহপাঠী এই ডাক্তারটি। ডাক্তার বলিয়াই এত প্রতিপত্তি, তাহা না হইলে—

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে বীরেন পুনরায় কাগজে মন দিল।

আকাশে যে মেঘখানা সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিল, সেটা সরিয়া গেল, চতুর্দ্দিক আবার রৌদ্রালোকিত হইয়া উঠিল।

২

রতনদীঘির পারে মেজ মায়ের পালকি নামানো হইয়াছে। গিন্নীমা এবং বড় বউ পালকি থামান নাই, সোজা চলিয়া গিয়াছেন। গিন্নীমার সহিত জিতুর মার পালকিটাও গিয়াছে। মেজ মা কিন্তু পারিলেন না। বেয়ারাগুলির ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং নিদারুণ রৌদ্র দেখিয়া রতনদীঘির পাড়ে বটগাছটার তলায় পালকিটা নামাইতে বলিলেন। বেচারীরা ঠাণ্ডায় একটু বিশ্রাম করিয়া লউক, এই কাঠ-ফাটা রোদে তাতিয়া পুড়িয়া একেবারে ঝলসাইয়া গিয়াছে যেন সকলে।

রতনদীঘির পানে চাহিয়া মেজ মা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রকাণ্ড দীঘি। কাকচক্ষু স্বচ্ছ কালো জল টলমল করিতেছে, চাহিয়া থাকিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ওপারের ঘাটটায় একজন বধূ স্নান করিতেছে, ঘাটের উপর চকচকে পিতলের কলসীটি বসানো রহিয়াছে। ওপারের ঢালু সবুজ প্বাড়টায় একদল ছাতারে পাখি কলরব করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া আহার সংগ্রহ করিতেছে। আরও ওদিকে

ফাঁকা মাঠে রৌদ্রতপ্ত শূন্যটা যেন কাঁপিতেছে, সেতারের তারে জোরে ঝঙ্কার দিলে তারগুলা যেমন কাঁপিতে থাকে, অনেকটা তেমনই।

সহসা মেজ মার হুঁশ হইল, টোকনটা কোথায় গেল? গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ওই যে, ছেলে শিকার করিতেছে। ফড়িং শিকার হইতেছে।

বটগাছটার ওধারে ছোট একটু মাঠের মত, সেখানে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানা বিচিত্র রঙের ফড়িং ঠিক ছোট ছোট এরোপ্লেনের মত উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঠটা চোরকাঁটায় ভর্ত্তি; শুকনো শুকনো মরা মরা আরও কি যেন অসংখ্য গাছ রহিয়াছে। ফড়িংগুলা তাহাদের ডালে বসিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। এক-একটা আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়াও থাকিতেছে। কিন্তু কেহই টোকনের নাগালের মধ্যে আসিতেছে না, বন্দুকের লক্ষ্য ঠিক হইতে না হইতেই উড়িয়া যাইতেছে। টোকন পা টিপিয়া আগাইয়া গিয়া উপবিষ্ট একটা ফড়িংকে টিপ করিতেছিল, এমন সময় মেজ মা ডাকিলেন, ওরে, যেখানে সেখানে কাঁটাবনে যাস নি তুই, এদিকে আয়।

টোকনের হাত কাঁপিয়া গেল, ফড়িং উড়িয়া গেল। টোকন বন্দুক-সুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া মেজ মার গলা জড়াইয়া মাটিতে পা ঠুকিতে লাগিল, কেন তুমি ডাকলে, উড়ে গেল ফড়িংটা!

আর রোদে রোদে ঘুরতে হবে না, পালকির ভেতর ব'স এসে। মেজ মা একরূপ জোর করিয়াই টোকনকে টানিয়া ভিতরে বসাইলেন। কি ভীষণ রোদ! এইটুকুর মধ্যে ছেলের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, টোকনের প্যান্ট হইতে চোরকাঁটাগুলা ছাড়াইয়া দিয়া মেজ মা বলিলেন, টোকন, শম্ভু সিংকে জিজ্ঞেস কর্ তো, বাবুদের হাতী কতক্ষণ আগে চ'লে গেছে!

শম্ভু সিং নামক বিরাটকায় সশস্ত্র সিপাহীটি পালকির তত্ত্বাবধায়করূপে

অশ্বপৃষ্ঠে সঙ্গে আসিয়াছে। প্রত্যেক পালকির সঙ্গেই একজন করিয়া অশ্বরোহী সশস্ত্র সিপাহী আছে। শম্ভু সিং অদূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জিরাইতেছিল। টোকনের কথা শুনিয়া সে বলিল, এক ঘণ্টা আগে হাতী চলিয়া গিয়াছে। মেজ মা একটু চিন্তিত হইলেন। বদ-মেজাজী নূতন হাতীটার পিঠে মেজবাবু চড়িয়াছেন। তাঁহার সহিত আবার চাঁপাটাও আছে। হাতীটা মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যায়। কি যে হইল, জানিবার জন্য তাঁহার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল, বেয়ারাগুলাকে ডাকাইয়া পালকি উঠাইতে বলেন; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল, অন্য পালকিগুলি পিছাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ফেলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে! ভগবান তাঁহাকে তো আর বড়দির মত নিশ্চিন্ত মন দেন নাই। উষা, মীনা, তরঙ্গিণী তিনজনই সমান। উহাদের পিছনে ফেলিয়া গিয়া কি মেজ মা কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! জামাই এবং হীরেন অবশ্য ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া উহাদের পিছু পিছুই আসিতেছে। কিন্তু উহারাও তো ছেলেমানুষ এবং সব কয়টিই হুজুগে। একটা পালকিতে প্রবীণ ঠাকুরদা এবং ঠানদি আছেন অবশ্য, কিন্তু তাঁহারা কি উহাদের সামলাইতে পারিবেন!

সুতরাং মেজ মা চিন্তিত মুখে অপর পালকিগুলির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

টোকন আবার বোধ হয় ফড়িং শিকারের চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ মেজ মা, ওটা কি?

মেজ মা ঘাড় ফিড়াইয়া দেখিলেন, বেশ বড় একটা বহুরূপী। সমস্ত দেহটা কুচকুচ কালো, কেবল গলার কাছটা টকটকে লাল। একটা ছোট ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সামনের পায়ে ভর দিয়া গলাটা উঁচু করিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতেছে।

মেজ মা বলিলেন, ও গিরগিটি।

টোকন সভয় বিস্ময়ে মেজ মার কাছে ঘেঁষিয়া জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

কামড়ায়?

না। ফের যাচ্ছিস তুই ওদিকে? না, মারতে হবে না ওকে।—টোকনকে টানিয়া পুনরায় তিনি পালকির ভিতর বসাইলেন ও আঁচল দিয়া মুখটা মুছাইয়া দিলেন।

এমন সময় ঠাকুরদা ও ঠানদির পালকি আসিয়া হাজির হইল। পালকি নামাইতেই ঠানদি বাহির হইয়া মেজ মার পালকির নিকট আসিয়া বলিলেন, কি ভাই, ব'সে আছ যে?

আপনাদের অপেক্ষায়। ওরা সব কই?

ওরা কি আর আমাদের মত! আমগাছে উঠেছে ওরা।

আমগাছে, বলেন কি? কে কে উঠেছে?

হীরেন আর উষা তো উঠেছে দেখে এলাম, মীনাকে ওঠবার জন্যে সাধাসাধি করছে।

আর তরঙ্গিণী?

সে খিলখিল ক'রে হাসছে আর আঁচল পেতে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়।

মেজ মা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, সত্যি, এরা যেন সব কি! একটু যদি হস্‌সি-দিশ্‌ঘি জ্ঞান আছে কারুর বাপু!

ঠানদি বলিলেন, ওরা সব আর জন্মে বাঁদর ছিল, এ জন্মে নেজটি খসেছে খালি।

আপনি নিয়ে এলেন না কেন ওদের ধ'রে?

আমার কথা শুনলে তো! তা ছাড়া আমি একটু তাড়াতাড়িই

চ'লে এলুম রতনদীঘিতে নাইব ব'লে। একটা ডুব দিয়ে না নিলে মাথা ধ'রে যাবে আমার। চিরকাল সকালে নাওয়া অভ্যেস তো। ওগো, আমার পুঁটলিটা কোথা, দাও তো, নেয়ে নিই।

এই যে।

ত্রস্ত ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরদা সকলের কাছে ঠানদিকে যেরূপ ভয়াবহরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন, ঠানদি মোটেই সেরূপ নহেন। ছোট খাটো মানুষটি, চওড়া চওড়া গড়ন, পাড়ার ফাজিল ছেলেমেয়েরা আড়ালে নাম দিয়াছে—গুট্‌কু। ধপধপে ফরসা রঙ, কপালের ঠিক মাঝখানটিতে টিপের আকারে ছোট্ট নীল একটি উলকি। মাথার চুলগুলি যদিও সব পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখে এখনও জরার চিহ্ন নাই। ঠানদি এককালে অপরূপ রূপসী ছিলেন; পাকা আমটির মত এখনও যেন টুকটুক করিতেছেন। অথচ বেশ রাশভারী।

পুঁটলি লইয়া ঠানদি বলিলেন, তেলের শিশিটা দাও।

ঢোক গিলিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, তেলের শিশি কি আমাকে দিয়েছিলে?

বাঃ, তোমার হাতে দিলুম না! ফেলে এসেছ নাকি?

ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিলে তিনি দ্বিধা হইবেন না। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া ঠাকুরদা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। বাহিরের বারান্দার তাকটার উপরই যে তেলের শিশিটা রহিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি ছাড়া আর কে বেশি জানে! তথাপি পালকির ভিতরে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খুঁজিবার ভান করিতে লাগিলেন। কিছু তো একটা করিতে হইবে। দৃষ্টিটা তো এড়ানো যাক আপাতত।

পালকির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঠানদি বলিলেন, তোমার

হাতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। এতকাল ধ'রে দেখছি তোমায়, তবু আমার জ্ঞান হ'ল না।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর বসিয়া, ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

রুখু নাইলে তো এখুনি মাথা ধ'রে যাবে আমার।

মেজ মা টোকনকে বলিলেন, শম্ভু সিংকে বল তো, ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে চাটুজ্জেদের হাট থেকে নারকোল-তেল নিয়ে আসুক খানিকটা। এই টাকাটা ভাঙিয়ে দাম দিয়ে দিতে বলিস, কেড়ে-কুড়ে না আনে যেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া শম্ভু সিং রওনা হইয়া গেল।

ঠানদি মেজ মার পালকির নিকট বসিয়া আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরদা কত জিনিস হারাইয়াছেন এবং নষ্ট করিয়াছেন, তাহারই একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগিলেন।

ঠাকুরদা পালকির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজের সম্বন্ধে নানারূপ অত্যুক্তি স্বকর্ণে শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। বরং এমন একটা ভাব ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন তিনি বধির, কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই শম্ভু সিং তেল আনিয়া হাজির করিল। মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঠানদি পালকিটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমিও তেল মেখে চান ক'রে নাও না।

গলাটা বাড়াইয়া ভালমানুষটির মত ঠাকুরদা বলিলেন, আমাকে বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে নয় তো আর কাকে বলব? আমসির মত শুকিয়ে থাকতে ভালও তো লাগে! চান ক'রে নাও।

এই যে নিই।

ঠাকুরদা বাহির হইয়া আসিলেন।

ঠানদি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, খুঁড়িয়ে হাটছ যে?

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের গাঁটটায় একটু ব্যথা হয়েছে।—অত্যন্ত সকরুণ দৃষ্টিতে ঠাকুরদা ঠানদির মুখের পানে চাহিলেন। ভাবটা যেন, দোহাই তোমার, আর কিছু বলিও না।

ঠানদি ক্ষণকাল ঠাকুরদার কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, হবে না! কাল রাত্তিরে পইপই ক'রে মানা করলাম, পুব দিকের জানলাটা খুলে শুয়ো না। বেতো শরীরে কি ওসব সয়? দরকার নেই চান ক'রে।

ঠাকুরদা সুট করিয়া পালকির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন।

ঠানদি স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় হৈ-হৈ করিয়া উষা-মীনা-তরঙ্গিণীর পালকি এবং তাহাদের পিছনে পিছনে অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন হীরেন আসিয়া পড়িল। দুইজনেরই পিঠে বন্দুক বাঁধা এবং পরনে ব্রিচেস প্রভৃতি সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুরেন ছেলেটি প্রিয়দর্শন, কিন্তু কালো। মুখখানি কাচ-কাচ। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো থাকাতে আরও কচি দেখায়। তাহার চালচলন কথাবার্তায় সহসা বুঝিবার উপায় নাই যে, সে বিলাত-ফেরত এবং ব্যারিস্টার। অর্থাৎ সুরেন সেই শ্রেণীর চতুর বিলাত-ফেরত, যাহারা কথায় কথায় নাসাকে কুঞ্চিত হইতে দেয় না। নাকের উপর রীতিমত 'কন্‌ট্রোল' আছে। তাহার যে কোন চাল নাই, এই প্রশংসনীয় ধারণাটা লোকের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য সে অহরহ সচেষ্ট;

তাহার অতিশয় সাদাসিধা দেশী ব্যবহারটা যে স্বাভাবিক নয়, তাহা একটু নজর করিলেই ধরা পড়ে।

যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা দেওয়া, মুড়ি-মুড়কি-গুড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, টোকনের সহিত কারণে অকারণে খুনসুড়ি করা, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, যেখানে সেখানে ধপ করিয়া বসিয়া পড়া, শাশুড়ীদের কাছে ছেলের মত আবদার করা, শ্বশুরদের সম্মুখে সিগারেট না খাওয়া, ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করা এবং ঠাকুরমার দেওয়া ষষ্ঠীপূজার টিপটা কপালে ধারণ করিয়া সকলের সম্মুখে উন্নত মস্তকে ঘুরিয়া বেড়ানো প্রভৃতি অনাধুনিক অব্যারিস্টারসুলভ আচরণ সুরেন সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে এবং সেইরূপ নিখুঁতভাবে করিতে চেষ্টা করে, যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ও নিখুঁতভাবে সে একদা সাহেবিয়ানা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার এই চালহীনতাটাও একটা চাল। ব্যারিস্টার-সমাজের ডিনার পার্টিতে যে এই ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে কাঁটা-চামচ ধরিয়া নিখুঁত পদ্ধতিতে আহার সমাধা করিতে পারে, অতিশয় ঔদাসীন্যভরে অতিশয় দামী মদ অতিশয় মুখরোচক বুকনি সহযোগে পার করিতে পারে, টাই কলার শার্ট হ্যাট মোজা জুতার অতি-আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে এই ব্যক্তিটিরই নখদর্পণে অর্থাৎ এই ন্যালাক্ষ্যাপা-গোছের জামাইটিই যে স্বসমাজে পুরাদস্তুর সাহেব, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তরের অন্তস্থলে সে সাহেব, না বাঙালী, তাহা সে নিজেও বোধ হয় ঠিক জানে না। যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও এখনও ঘটে নাই। যখন যেখানে যাহা মানায়, তাহাই ঠিকভাবে করিয়া যাওয়াটাই এখন জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'সাক্‌সেস্‌ফুল ম্যান', সুরেন তাহাই। সুরবোধ আছে, বেসুরা অথবা বেফাঁস কিছু করিবার ছেলে সে নয়।

হীরেন ছোকরাটি ঠিক ইহার বিপরীত। অনাবৃত চালিয়াৎ। সুরেনের মত অকারণে একটা আবরণের বোঝা বহিতে সে প্রস্তুত নয়। সে যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., সে যে আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে যে বড়লোকের ছেলে, সে যে রূপবান, সে যে ভাল খেলোয়াড়—অর্থাৎ গল্পের আদর্শ নায়ক হইবার সমস্ত যোগ্যতাই যে তাহার আছে, তাহা অনর্থক লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না। হীরেন যে ঘোড়সওয়ার, তাহা সকলেই অনেক আগে জানিত, কিন্তু সুরেনও যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এবং হীরেনের অপেক্ষা ভাল করিয়া পারে, তাহা জানা গিয়াছে আজ সকালে। সুরেনের হাতীতেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু হীরেন ঘোড়ায় যাইবে শুনিয়া সেও ঘোড়ায় আসিয়াছে। উষার প্রতি হীরেন যে আকৃষ্ট, তাহা লুকানো নাই। কিন্তু উষার প্রতি সুরেনের সত্য মনোভাবটা যে কি, তাহা কেহ ঠিক জানে না, এমন কি উষাও না। যেরূপ সহৃদয় কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত উষার সর্ব্বপ্রকার শখ ও দাবি সুরেন মিটাইয়া দেয়, তাহাতে অন্য কিছু মনে করা অসম্ভব। তা ছাড়া স্বামীর মনোলোকের নিগূঢ় খবর লইবার মত মননশীলতা উষার এখনও হয় নাই। স্বামীর ঐশ্বর্য্য ও বাহ্য রূপ লইয়াই উষা মত্ত।

পালকি নামাইতেই উষা, মীনা এবং তরঙ্গিণী আসিয়া মেজ মার পালকি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উষার দামী ঢাকাইখানা খোঁচ লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর কোঁচড়ে এক কোঁচড় আম। মীনার চোখ-মুখ হাস্যপ্রদীপ্ত, কিন্তু তাহার বেশবাস বিস্রস্ত হয় নাই ; সুরেনের উৎসাহ সত্ত্বেও সে গাছে চড়ে নাই।

দামী কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উষা খুব যে দুঃখিত, তাহা

মনে হইতেছে না। বরং খুশিতে তাহার চোখ-মুখ ঝলমল করিতেছে। আসিয়াই হাত-মুখ নাড়িয়া মেজ মাকে বলিতে শুরু করিয়া দিল, উঃ, মেজ মা, তুমি যদি দেখতে, রাস্তার ধারে একটা গাছে সে কি আম! গাছ যেন একেবারে ভেঙে পড়ছে! পাতা দেখা যায় না এত আম! পেড়ে এনেছি আমরা।

মেজ মা চটিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তাহা ছাড়া সুরেন কাছেই ঘোড়ার উপর রহিয়াছে, হয়তো কি মনে করিবে! তাই তিনি মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া বলিলেন, বেশ করেছ। এইবার চল সব, এখনও ঢের দূরে যেতে হবে।

তরঙ্গিণী কোঁচড় হইতে আম বাহির করিলেন। মেজ মাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেখাইয়া বলিলেন, কেমন চমৎকার দেখতে দেখ মেজদি, যেন টুকটুক করছে!

মেজ মা প্রলুব্ধ হইলেন না, প্রলুব্ধ হইল টোকন। সে দুই হাতে দুইটা আম লইয়া পালকির ওপাশে চলিয়া গেল। সুরেন ঘোড়াটা একটু আগাইয়া লইয়া গিয়া ঠানদির সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিল।

ঠানদি, আপনি চ'লে এলেন, তা না হ'লে আরও আম আনতে পারতুম আমরা। বললাম, চলুন আপনি গাছে। এসব কি এদের কর্ম, পিঁপড়ের ভয়ে পালিয়ে এল সব।

নিজের দল ভারী হওয়াতে ঠাকুরদা সম্ভবত কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, আমি এর প্রতিবাদ করছি। পিঁপড়েরা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করবে, এতটা নীরস এখনও হন নি তোমাদের ঠানদি।

ঠানদি পুঁটলি হইতে ছোট কাঠের আয়নাটি ও সিঁদুরের কৌটা বাহির করিয়া পাকা চুলে সিঁদুর পরিতেছিলেন। সিঁদুরটি পরিপাটিরূপে

পরিয়া স্থরেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখন আমার সময় গেছে ভাই, যা খুশি ব'লে যাও, হাতী দঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়। চল্লিশ বছর আগে যদি আসতে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতুম। এখনও তার সাক্ষী আছে একজন, জিজ্ঞেস কর।

যে ব্যক্তি গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখিয়াছে, গিরিশ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাহার যেমন মুখভাব হয়, ঠানদির যৌবন-প্রসঙ্গে ঠাকুরদাও তেমনই একটা গদগদ মুখভাব করিয়া স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

উষা আসিয়া বলিল, ঠাকুরদা, আম খাবেন ?

উল্লসিত ঠাকুরদা বলিলেন, নিশ্চয়, সেই আশাতেই তো ব'সে আছি ভাই।

ঠানদি বক্র কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন, এখন আবার অসময়ে আম খাওয়া কেন ? অত্যেচার কর ব'লেই তো—

ঠাকুরদা যেন নিবিয়া গেলেন।

আচ্ছা, তবে থাক্‌।

উষা আর মীনায় চোখে চোখে কি একটা কথা হইয়া গেল। উষা সরিয়া পড়িল। সকলেই ইহা জানিয়া ফেলিয়াছে, কোন যুবতী মেয়ের কাছে ঠানদি সহজে ঠাকুরদাকে ঘেঁষিতে দেন না। সম্পর্ক এবং ওজুহাত যাই হোক, কম-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখিলেই ঠানদির মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

হীরেন ঘোড়া হইতে নামিয়া একটু দূরে ঘোড়ার পিঠের উপর ডান হাতটা রাখিয়া আপন মনে শিস দিতেছিল এবং উষার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

সুরেন একটু সরিয়া যাওয়াতে মেজ মা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরা কি বল্ দিকি! গাছে চড়েছিলি সব! তোর বয়েস দিন দিন কমছে, না বাড়ছে? তুই সম্পর্কে শাশুড়ী না?

তরঙ্গিণী এমন একটা মুখভাব করিলেন, যেন তিনি নিরীহতার প্রতিমূর্ত্তি।

আমি তো চড়ি নি, আমি তো বরং মানা করলুম ওদের। উষাকে তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে এমন মাথায় চড়িয়েছ যে, এখন শোনে নাকি কারও কথা? তা ছাড়া সুরেনই তো তুললে হুজুকটি; আমি কি করব?

তোমাকে যেন চিনি না আমি। ছোটবাবুকে ব'লে দিচ্ছি দাঁড়াও গিয়ে—

বাঃ রে, ওরা চড়ল গাছে, আর দোষ হ'ল আমার?

মেজ মা পালকির ভিতর ঢুকিয়া পালকির ওধারে আম্র-ভক্ষণ-নিরত টোকনকে ধমক দিলেন, আমের রসে জামা-টামা সব এক করলে তো!

তরঙ্গিণী পাতলা ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী মেজ জাকে একটু ভেঙাইলেন। তাহার পর কোঁচড় হইতে মনোমত একটি আম বাছিয়া বাহির করিলেন এবং বোঁটার উলটা দিকে দাঁত দিয়া ছোট একটি ছিদ্র করিয়া চুষিতে লাগিল।

মীনা মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া এক ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল— কেমন যেন একটা ভাষাহীন অস্বস্তি। তাহার অস্বস্তি আরও বাড়িয়া গেল, যখন সুরেন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, চল তো, আমরা দুজনে চুপিচুপি দীঘির ওধারটায় গিয়ে দেখে আসি, টুপটুপ ক'রে ডুব দিচ্ছে ওগুলো পানকৌড়ি, না পাতিহাঁস।

মীনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লক্ষ্য করিল এবং বলিল, যাবার দরকার নেই, ওগুলো পানকৌড়িই।

হাঁস হতে বাধা কি?

মীনা উত্তর দিল না, শুধু একটু মুচকি হাসিল।'

মেজ মা মেজবাবুর জন্য মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পালকি উঠাইতে আদেশ করিলেন।

পানকৌড়ি-হাঁস-সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

সকলে আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

৩

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

দীর্ঘ পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত প্রকৃতি আচ্ছন্ন। বড় বউ পালকির মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পালকি-বাহকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। গিন্নীমা ও জিতুর মা আগাইয়া গিয়াছেন। বড় বউ একা চলিয়াছেন—একেবারে একা। চারিদিকে কোথাও কেহ নাই। মাঠও জনশূন্য।

বড় বউ জীবনে এতক্ষণ ধরিয়া এমন একা আর কখনও থাকেন নাই। সারা জীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়াছে, এমন নির্জ্জন অবসর জীবনে আর কখনও আসে নাই। নিজের একক সত্তার নিঃসঙ্গ দৈন্যের পানে চাহিয়া বড় বউ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, কোথায় যাইতেছি আমি, কি করিতে যাইতেছি? অভিনয় করিতে? কাহার সম্মুখে? তাক লাগাইয়া দিব? কাহাকে? কেন? কি লাভ হইবে? অভিনয়-নৈপুণ্যে তাক

লাগাইয়া দেওয়াটাই কি জীবনের পরমার্থ? সমস্ত জীবনটাই তো রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে কাটিয়াছে। নিত্যনূতন পাদ-প্রদীপ, নিত্যনূতন দর্শক, নিত্যনূতন প্রসাধন, নিত্যনূতন ঐক্যতান, নিত্যনূতন ভূমিকা। কি লাভ হইয়াছে? অভিনয় হয়তো সফল হইয়াছে, দর্শকেরা হয়তো বিস্ময় মানিয়াছে, কিন্তু অন্তরবাসিনী ভিখারিণীর শূন্য ভিক্ষাপাত্র আজও তো শূন্য। কবে তাহা পূর্ণ হইবে? কে তাহা পূর্ণ করিবে? এই শূন্যতা আর কতকাল বহন করিতে হইবে?

পালকি-বাহকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতেছে, ভিখারিণীর মত যদি ভিক্ষা করিতে পারিতে, হয়তো তোমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিত। আত্মসম্মানের ঝুটা অলঙ্কারে সারা জীবন নিজেকে রাজেন্দ্রাণী সাজাইয়া রাখিয়াছ। সকলে বাহবা দিয়াছে, ঈর্ষা করিয়াছে। কেহ ভালবাসে নাই, কেহ করুণা করে নাই। করিবে কি করিয়া? রাজেন্দ্রাণীকে কেহ কখনও করুণা করিবার সাহস করে? ভিখারিণী তো কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ভিখারিণীর স্বরূপটা অবলুপ্ত করাই যে জীবনের সাধনা ছিল। আবার অভিনয়? আবার ডাক লাগাইয়া দিবার চেষ্টা?

সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি আজীবন উপবাস করিয়া আছেন, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কেন? কিসের অভাব তাঁহার? হাত বাড়াইয়া লইলেই তো হয়। লজ্জা করে? অনাহারে পিপাসায় সমস্ত অন্তর ছারখার হইয়া গেল, তবু লজ্জা? তবু অভিনয়? জীবনের কত পরম লগ্ন আসিল ও চলিয়া গেল, আর কয়টাই বা আসিবে? এখনও অভিনয়?

আবার হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। না, পারিব না। উঁচু মাথাটা ধূলায় লুটাইয়া দিতে কিছুতেই পারিব না। অভিনয়ই করিতে হইবে।

অন্তরদ্বার খুলিয়া দিলেই কি সে সেখানে প্রবেশ করিবে? নিশ্চয়তা কি? দ্বার খুলিয়া বসিয়া বসিয়া যদি রাত পোহাইয়া যায়? সে অপমান, সে লজ্জার অপেক্ষা দ্বার বন্ধ রাখাই ভাল। সত্যই যদি আসে, দ্বারে করাঘাত করুক।

বড় বউ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে রিক্তশস্য শূন্য মাঠ ধু-ধু করিতেছে। প্রখর রৌদ্র নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে। দূরে, অতি দূরে কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকিতেছে।

অতি সকরুণ মিনতি।

কাহাকে মিনতি করিতেছে?

বড় বউ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

৪

গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে।

প্রথমেই গোহুম্‌নিকে লইয়া বিরিঞ্চির গাড়িখানা আসিতেছিল। কিন্তু এখন প্রথমে যে গাড়িখানা আছে, তাহা বিরিঞ্চির নয়। দ্বিতীয় গাড়িখানিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কড়া রোদ উঠাতে স্থূলকায় তিনুর কষ্ট হইতেছে। তিনি ছাতা খুলিয়াছেন, একটি ভিজানো লাল গামছা টাকের উপর রাখিয়াছেন এবং এতৎসত্ত্বেও নিদারুণ রকম ঘামিতেছেন। মাথা হইতে গামছা নামাইয়া

বারংবার মুখ মুছিতে হইতেছে, কিন্তু মোছার সঙ্গে সঙ্গেই কপালে নাকে চিবুকে পুনরায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিতেছে। রোগা নিতাই ঘাড়টাকে একটু বাঁকাইয়া তিনুর ছাতার তলায় আশ্রয় লইয়াছে।

মুখটা গামছা দিয়া আর একবার মুছিয়া লইয়া স্থূলকায় তিনু বলিলেন, গাড়িতে চড়াই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে। হেঁটে গেলেই হ'ত। এ দশ ক্রোশ ইচ্ছে করলে ঘণ্টা চারেকে কাবার ক'রে দেওয়া যায়। ঢিকিস ঢিকিস ক'রে কতক্ষণে যে পৌঁছুব!

নিতাই বলিল, তোমার বোধ হয় চার ঘণ্টাও লাগে না।

তিনু মনে মনে হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, আজকাল আর অতটা স্পীড নেই ভায়া। বয়স তো হচ্ছে।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিতাই ইহার প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু নিতাই একেবারে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

শিকার-টিকারের ব্যবস্থাটা কি রকম হয়েছে, শুনেছ? নীলু দত্ত তো আমাদের কিছু করতে দেবে না, নিজেই হামরাই হয়ে সব করছে।

তিনু মুখ মুছিয়া বলিলেন, মরুকগে।

আমার ইচ্ছে ছিল, মাচা-টাচাগুলো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাব। মাচা মজবুত না হ'লে মহা বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। বাঘ নিয়ে কারবার, বুঝছ না?

তিনু হয়তো বুঝিলেন, কিন্তু উদ্বিগ্ন হইলেন না। বলিলেন, তামাক সাজ আর এক ছিলিম।

কলিকায় তামাক ভরিতে ভরিতে নিতাই আবার বলিল, সেবারে সিঙ্গিবাবুদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। মধ্যম বাবু আর আমি ছিলাম একটি মাচাতে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! মধ্যম বাবু কি রকম ভারী ওজনের লোক জান তো? মাচাই গেল ভেঙে। দুজনায় ঠিক পড়লাম

একেবারে বাঘের মুখটিতে। মধ্যম বাবুর তো একেবারে ফিট। ভাগ্যে আমি ছিলাম, টক ক'রে উঠে মাটিতে দাঁড়িয়েই দিলাম দেগে এক গুলি বাছাধনের বুকে। বিকট গর্জ্জন ক'রে পড়লেন নালাটার ওপর উলটে।

নিতাইয়ের এসব কথা তিনু চাটুজ্জে কখনও বিশ্বাস করেন না, এখনও করিলেন না। মধ্যম বাবুর স্থূলতার উল্লেখে মনে মনে একটু চটিলেনও। নিজে কাঠির মত রোগা কিনা, তাই স্বাস্থ্যবান লোক দেখিলে মোটা বলিয়া ঠাট্টা করা হয়! বাঘের মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন, অথচ বাঘ উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে! দিতেও পারে, খাইবার মত উহার শরীরে কিই বা আছে! বড় জোর খড়কে হইতে পারে।

কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছু বলিলেন না, আর একবার মুখ মুছিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

নিতাই টিকা ধরাইতে ধরাইতে পুনরায় প্রশ্ন করিল, নীলু দত্ত কি রকম ব্যবস্থা করেছে, শুনেছ কিছু?

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনু অবশেষে বলিলেন, গোটা তিনেক মাচা তৈরি করাবে আর একটা মোষের বাচ্চাও নাকি বেঁধে রাখবে, এই তো বলেছিল আমাকে।

নাও, ধরাও।

তিনুর হাতে হুঁকাটা দিয়া চিন্তিত মুখে নিতাই বলিল, গেলেই হ'ত নীলুর সঙ্গে। আনাড়ী লোক তো, কি করতে কি ক'রে ব'সে আছে হয়তো!

সম্মুখের মাঠটার উপর এক ঝাঁক টিয়াপাখি চক্রাকারে উড়িয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া তিনু চাটুজ্জে নীরবে তাম্রকূট সেবা করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। তিনি মাচা লইয়া মোটেই

মাথা ঘামাইতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন বাকি খাজনাটার কথা। এতগুলা টাকা কি ছোটবাবু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইবেন? আগে চৌধুরীটাকে দুই-চারি টাকা দিলেই কাজ হইয়া যাইত। এখন ছোটবাবুর আমলে সেসব হইবার উপায় নাই। ছোটবাবুকে কোন রকমে তোয়াজ করিবার জন্য শিকারে আসা। অকারণে এই ছেলে-ছোকরাদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিতে কোন দিনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষত আজকালকার ছোঁড়াগুলার রকম-সকমই বেয়াড়া-ধরনের। মানীর মান রাখিয়া চলিতে জানে না। হয়তো ফসফস করিয়া নাকের সামনে সিগারেটই টানিয়া দিবে। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর। দুশো বাহান্ন টাকা এগারো আনা—সহজ কথা নয় তো! নীলু দত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই হুজুকের মুখে ছোটবাবু আইনের কঠিন গ্রন্থি হয়তো একটু শিথিল করিতে পারেন, এবং কলমিপুরের মাঠে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ধরিলে হয়তো কাজটা হাসিল হইয়া যাইতে পারে। নীলু দত্তের আর একটা কথা মনে পড়াতে তিনু চাটুজ্জে ঘাড় বাঁকাইয়া তৃতীয় গাড়িটার দিকে একবার নজর করিলেন। হাঁ, ঐ গাড়িতেই তো লছমনিয়া ছুঁড়ীটা রহিয়াছে। নীলু দত্তের কথা সত্য হইলে ওই ছুঁড়ীটাকে হাত করিতে পারিলেও কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। নীলুর মতে, উহার স্বামী ভিকুকে গভীর উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি ছোটবাবু খানসামা-পদে বাহাল করিয়াছেন। টাক হইতে গামছা নামাইয়া চাটুজ্জে মশাই আর একবার মুখ ও বগল মুছিলেন, আর একবার আড়চোখে (হুঁকায় মুখ রাখিয়া) লছমনিয়াকে দেখিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, সহজভাবে যদি কার্য্যোদ্ধার না হয়, শেষটা বাঁকা পথই ধরিতে হইবে। মেয়েটাকে গোটা দশেক টাকা খাওয়াইলেই চলিবে বোধ হয়।

দশটা টাকা কিছু নয়, কিন্তু ওসব নোংরামির মধ্যে যাইতেই কেমন গা-ঘিনঘিন করে চাটুজ্জে মশাইয়ের। কিন্তু কাজের নাম বাবাঠাকুর।

নিতাই ভাবিতেছিল, মাচা তিনটায় কে কে বসিবে?

একটাতে জামাই আর একটাতে হীরেন, আর একটাতে? তালুকদারটা তো বন্দুক উঁচাইয়া সঙ্গে আসিয়াছে, ওই নিশ্চয় বসিতে চাহিবে। কিন্তু শিকারের কি জানে ও? গাদা বন্দুকটার অহঙ্কারে গেল লোকটা। হয়তো উহারই সহিত তৃতীয় মাচাটায় বসিতে হইবে আমাকে। বসিব, কিন্তু অসহ্য।

এখন যে গাড়িটা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে তালুকদার বেশ একটু চিন্তিত হইয়াই বসিয়া ছিলেন।' যদিও তিনি তৃতীয় গাড়িতেই বেশি নজর রাখিতেছিলেন এবং লছমনিয়ার হলুদ রঙের শাড়িখানার প্রতি ভাঁজটি প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, গোহমূনি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। গোহমূনিকে লইয়া বিরিঞ্চিটা মাঠ ভাঙিয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হইল? বলিয়া গেল বটে, মাঠটার ওপারেই দৌলতপুরে তাহার বাড়ি এবং সে বাড়ি হইতে নিজের কাপড় গামছা আনিতে যাইতেছে। কিন্তু বিরিঞ্চিকে কে না চেনে! ও ব্যাটার অসাধ্য তো কিছুই নাই। তালুকদার অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আর একবার লছমনিয়ারই পানে চাহিলেন।

কল্পনাবান হরিশ-খুড়োর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। আবার তিনি বাঘের গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তালুকদার তাঁহার গল্প শুনিতেছেন কি না, তাহাও আর তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন না। এইবার

তিনি নানা রকম অসাধারণ বাঘের প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিলেন। বাঘ অনেক সময় আবার সাধক হয়, তা জান তো? মানে—মানুষকে হার মানিয়ে দেয়। একটি বাঘের কথা জানি আমি, কনখল অঞ্চলে আছে সেটি, অদ্ভুত সে বাঘ। বাইরের চেহারাতেই বাঘ, কিন্তু ভেতরে সে পরমহংস। দুটি বেলা গঙ্গায় নেমে আহ্নিক করে, থাবা তুলে জপ করে, মাছ-মাংস খায় না, একেবারে বিশুদ্ধ ফলাহারী। একবার হয়েছে কি, বাঘটা গঙ্গায় নেমে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাবায় ক'রে জল তুলে তুলে অর্ঘ্য দিচ্ছে, এমন সময় তা পুলিস-সায়েবের নজরে প'ড়ে গেল। আর কথা আছে! বন্দুক তুলেই দিলেন ফায়ার ক'রে। সায়েবের লক্ষ্য অব্যর্থ, গুলিও গিয়ে ঠিক বিঁধল মাথায়, কিন্তু বাঘ পড়ল না। ঠিক সমানে ব'সে ব'সে অর্ঘ্য দিয়ে যেতে লাগল। সায়েব তো অবাক। বাঘ অর্ঘ্য দেওয়া শেষ ক'রে দুটি থাবা জুড়ে সূর্য্যপ্রণাম করলে, তারপর সায়েবের দিকে এক নজর চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল। পাণ্ডা ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এতক্ষণ কিছু বলে নি। বাঘটা চ'লে গেলে সায়েবকে সব কথা খুলে বললে। সমস্ত কথা শুনে সায়েব হ্যাট তুলে বাঘের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালেন। আসল সায়েব-বাচ্চা কিনা, গুণের কদর জানে।

খুড়ো চুপ করিলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, কোন শাপভ্রষ্ট যোগী-টোগী সম্ভবত। তালুকদার একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, লছমনিয়াটা তাঁহার দিকে অমন করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল কেন? খুড়ো একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া পুনরায় শুরু করিলেন, আর এক প্রকার বাঘ আছে, বুঝেছ তালুকদার?

হ্যাঁ বল, সব শুনে যাচ্ছি আমি।

আর এক প্রকার বাঘ আছে, যারা বহুরূপী। যখন যা ইচ্ছে রূপ ধারণ করতে পারে। সে বড় সঙিন ব্যাপার, বুঝেছ ?

লছমনিয়া আবার হঠাৎ ফিরিয়া বসিল।

তালুকদার নির্নিমেষ হইয়া গেলেন, খুড়োর কথায় সায় পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন না। কিন্তু খুড়োর এখন এমন অবস্থা, কোন কিছুর আর অপেক্ষা রাখেন না তিনি। তিনি বলিয়া চলিলেন, সে বড় সঙিন ব্যাপার হে। মানুষের রূপ ধ'রে দিনের বেলা লোকালয়ে আসে, কিচ্ছু চেনবার জো নেই, একেবারে হুবহু মানুষ। কিন্তু নিষুতি রাত যেই হ'ল, অমনই নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। সামনে যাকে পেলেন, কঁ্যাক ক'রে ধরলেন, মট ক'রে ঘাড়টি মুচড়ে আহারটি সমাধা করলেন, আবার দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধ'রে সাফ বেরিয়ে গেলেন। ধরবার-ছোঁবার জো নেই, বুঝলে ?

ব'লে যাও না, সব শুনছি আমি।

মাঝে মাঝে মানুষ ছাগল গরু ভেড়া যে না-পাত্তা হয়ে যায়, আমার মনে হয়, এইই তার কারণ। অথচ পুলিস এর কিছুই খবর রাখে না, জানেই না।

খুড়ো বিড়িতে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, আর এক রকম বাঘ আছে, যারা কীটের রূপ ধারণ ক'রে বেড়ায়। ইংরিজীতে ছারপোকাকে তো বাঘ বলে জানই, কিন্তু ছারপোকাই যে শুধু বাঘ, তা নয়। মশা, এঁটুলি, উকুন, জোঁক—সব বাঘ। তা ছাড়া আরও কত আছে, বাঘের মহিমার কি শেষ আছে!

খুড়ো বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়া পুনরায় কল্পনাস্রোত দিতে লাগিলেন।

লছমনিয়া মুশকিলে পড়িয়াছিল। এদিকে ভিকু, ওদিকে তালুকদার। ভিকুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে লজ্জা করে, তালুকদারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসা তো আরও অসম্ভব। মুখপোড়ার ড্যাবডেবে চোখ দুইটা যেন গিলিতে আসিতেছে!

কাদম্বিনী ঢুলিতেছিল।

কালীর মা আধ-ঘোমটা টানিয়া নির্ব্বিকারভাবে পিছনের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

ইহার পরের গাড়িটা মালপত্রে বোঝাই।

তাহার ছোকরা গাড়োয়ানটা হয়তো লছমনিয়া কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াই অসময়ে গলা ছাড়িয়া একটা হোলির গান ধরিয়াছে। তাহার পরের গাড়ি অর্থাৎ পঞ্চম গাড়িতে হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে উন্নত মস্তকে সিধা বসিয়া ছিল। মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকিয়া যায় নাই, সুগঠিত দেহটির কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নাই। সামান্য লাল শালুর পাগড়িটা রৌদ্র-কিরণে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম গাড়িতে নীলমণি একাই শুইয়া ছিল।

দীনু গাড়োয়ানকে কিছুতেই উত্তেজিত করিতে না পারিয়া বিরক্ত বিশ্বম্ভর অবশেষে গাড়ি হইতে নামিয়া গিয়াছে। চুপচাপ নিরুত্তেজিত-ভাবে মন্থরগতি গরুর গাড়িতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা রোদে হাঁটিয়া যাওয়া ঢের ভাল। তবু খানিকটা গরম হওয়া যায়। ওই দীনুটা কি মানুষ! ওটাও গরু।

কুঞ্জলালের দল কিন্তু জমাইতেছিল।

নিদারুণ রৌদ্র সত্ত্বেও কুঞ্জলাল বাজাইতেছিল—মঞ্জুল মঞ্জরী নব

সাজে। বঙ্কু ছাড়া বাকি সকলেই কোরাসে গান ধরিয়াছিল, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির বীরেন পর্য্যন্ত। বঙ্কু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু সুরের মোহিনী-শক্তি আছে, বঙ্কু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ মাথা নাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে মুখভঙ্গী করিতে করিতে হাঁটুতে তবলা বাজাইতে শুরু করিয়া দিল। হাবুল আর পাঁচুর চোখে চোখে একটা ইশারা হইয়া গেল, এবং সহসা সকলে একযোগে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বঙ্কু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেল।

জগদেও পাঁড়েও গানটা উপভোগ করিতেছিল। হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, বোন্ কোরলেন কেন? ফিনসে শুরু করুন।

কুঞ্জ আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

হাবুল বলিল, এই বঙ্কা, ফের বাজা।

রাগে বঙ্কুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে ঠিক করিয়াছে, কিছুতে রাগিবে না। তাই মুখ গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হাবুল বলিল, দেখ্ দেখ্।

সকলে দেখিল, একদল পল্লীবধূ কোমরে কলসী লইয়া দূরের আল-পথটা ধরিয়া মাঠের মাঝখানে একটা পুকুরের দিকে চলিয়াছে তাহাদের পিছন পিছুন একদল বাজনদার বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে।

পাঁচু বলিল, জল সইতে যাচ্ছে সব, বিয়ে বোধ হয় কারও বাড়িতে।.

কুঞ্জলাল বলিল, হ্যাঁ রে বঙ্কা, তোর বিয়েতেও জল সইতে গেছল সব এমনই ক'রে?

বিস্ময়ের সুরে হাবুল প্রশ্ন করিল, এ কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

বক্সা বিয়ে করছে ব'লে জল সইতে যাবে না কেউ? কি যে বলিস তার ঠিক নেই!

পাঁচু মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতেছিল।

বক্সু চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

৫

ফাঁকা মাঠ।

বিরিঞ্চির গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাল তেজী বয়েল ঘোড়ার মতন ছুটিতেছে। গোহুম্নি তখনও নির্বিকারভাবে চিনাবাদাম চিবাইতেছিল, একটি কথা বলে নাই। শেষ চিনাবাদামটি পরিপাটিরূপে ছাড়াইয়া এবং সেটি মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গোহুম্নি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরিঞ্চির দিকে চাহিল। বিরিঞ্চি দেখিতে পাইল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে গরু দুইটাকে হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

গোহুম্নি চিনাবাদামটি সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, এইবার বল্ দেখি, কোথায় চলেছিস তুই? কাপড়-গামছার কথা যে মিছে, তা তো গোড়াতেই বুঝেছি। গাড়ির ঝুলিতে তোর কাপড় গামছা রয়েছে, তাও দেখতে পাচ্ছি। মতলব কি তোর?

বিরিঞ্চি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গোহুম্নির দিকে চাহিল, কোন উত্তর দিল না। কেবল একটু ঝুঁকিয়া গরু দুইটার শিরদাঁড়ার উপর দুই হাত দিয়া সুড়সুড়ি দিয়া তাহাদের গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

জবাব দিচ্ছিস না যে?

বিরিঞ্চি আর একবার হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, জবাব দিল না।

গোহমনি তখন একটু আগাইয়া গিয়া বিরিঞ্চির পিছনের দিকের চুল ধরিয়া এক টান দিল।

শিগগির বল্, কোথা নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ?

বিরিঞ্চি এবারও কোন জবাব দিল না। কেবল প্রাণপণে বলদ দুইটাকে হাঁকাইতে লাগিল।

রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন মাঠে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, গোহমনির নীল শাড়ির আঁচলখানা হাওয়ায় উড়িতেছে, তেজী বলদ দুইটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, বিরিঞ্চি উন্মাদের মত তাহাদের হাঁকাইয়া চলিয়াছে।

৬

জলন্ধর বিলের ধার দিয়া যে রাস্তাটা কালভৈরবের মাঠ পার হইয়া নালতে গ্রামে গিয়া পৌছিয়াছে, সেই রাস্তায় মোটর-বাইক হাঁকাইয়া ফট-ফট-ফট-ফট শব্দ করিতে করিতে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া বাদল ডাক্তার চলিয়াছেন। বাতাসপুর হইতে রোগী দেখিয়া তিনি ফিরিতেছেন। সকলের সঙ্গে ভোরবেলা ডাক্তারবাবু বাহির হইতে পারেন নাই। বাতাসপুরের রোগীই অবশ্য তাহার একমাত্র কারণ নহে, আরও একটা নিগূঢ় কারণ ছিল—সকালের ডাকটা। সকালের ডাকটা কিছুদিন হইতে ডাক্তারবাবুর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ডাকটা না দেখিয়া বাহির হইলে কিছুতে স্বস্তি পান না। ডাকটা দেখিয়া কিন্তু তাঁহার অস্বস্তি আজ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে চিঠিটা নিশ্চয় আসিবে মনে করিয়াছিলেন, সেইখানাই আসে নাই। আসিয়াছে

কতকগুলো বাজে বিজ্ঞাপন আর পিসীমার একখানা চিঠি। মায়ার চিঠি আসে নাই।

মায়া নাম্নী মেয়েটি (এখন অবশ্য মহিলাটি, কারণ তিনি এম. এ. পাস এবং কিছুদিন হইতে একটি স্কুলের প্রধান-শিক্ষয়িত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন) বাদল ডাক্তারের মামাতো দাদার বড় শালী। দাদার শালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সামাজিক অধিকার সকল ভ্রাতারই আছে এবং সে অধিকারের সুযোগ লইতে বাদল ডাক্তার কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু অধিকারমদে মত্ত হইয়া একটি প্রয়োজনীয় সত্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নিদারুণ বজ্রাঘাতের মত সে সত্যটি সহসা একদিন তাঁহার সচেতন সত্তার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। উভয়েরই গোত্র এক। দুইজনেই মুখোপাধ্যায়-বংশসম্ভূত। পঞ্চবাণের পাঁচটা বাণই ভোঁতা হইয়া গেল।

গোত্র সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অবধি মায়ার মনও কেমন যেন গুটাইয়া গিয়াছে। বিপদের সম্ভাবনায় শামুক অথবা কাছিম যেমন মুখ গুটাইয়া লয়, অনেকটা তেমনই। নিকটে থাকিলে সংযত, শোভন এবং অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মায়া আজকাল আর বলে না। আগেও যে খুব বেশি বলিত, তাহা নয়; তবুও যাহা বলিত, তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি রঙ থাকিত। আজকাল সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ফ্যাকাশে ধরনের হইয়া গিয়াছে। চিঠিপত্র যাহা লেখে, তাহা না লিখিলেও চলিত। অর্থাৎ মায়ার বঁড়শিতে যে মাছটা ধরা পড়িয়াছিল, শাস্ত্রে তাহা খাইতে মানা। সুতরাং বঁড়শিটি খুলিয়া সে মাছটিকে আবার জলে ছাড়িয়া দিয়াছে। মাছ কিন্তু বঁড়শিটাকে ভুলিতে পারিতেছে না। মারাত্মক ক্ষতটা এখনও জ্বালা করিতেছে।

মায়ার অতি সাধারণ আমি-ভাল-আছি-আপনি-কেমন-আছেন-গোছ

চিঠির জন্যই বাদল ডাক্তার এখনও সমুৎসুক। বাদল ডাক্তারের চরিত্রে আর একটি মহৎ দোষ আছে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া কবিতা লেখেন। নিতান্ত মন্দ লেখেন না, অন্তত মায়াকে মুগ্ধ করিয়া দিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ভাল।

জলন্ধর বিল প্রকাণ্ড বিল। খানিকটা শুকাইয়া এখন ডাঙা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এটুকুও ডুবিয়া যায়। ডাঙার উপর গরু ভেড়া ছাগল শালিক একসঙ্গে চরিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূরে কয়েকটা হনুমানও একটা গাছে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। একটা নিভৃত অংশে কয়েকটি বক নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছে। বিলে মাছ খুব, মাঝে মাঝে দুই-একটা লাফাইয়া উঠিতেছে। ওপারে একজোড়া মানিকজোড় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর এক অংশে সারস-জাতীয় প্রকাণ্ড একটা পাখি এক পায়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক তাহার মাথার উপরে একটা শঙ্খচিল উড়িয়া বেড়াইতেছে, সেদিকে তাহার খেয়াল নাই। বিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা কুমীর গা ভাসাইয়া নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে ; না জানিলে মনে হইবে, একটা কাঠ ভাসিতেছে বুঝি। ঠিক তাহারই পাশে ভাসিতেছে প্রকাণ্ড সাদা একটা মেঘের ছায়া। দূরে জেলেদের জাল শুকাইতেছে। ছোট ছোট মাছ ধরিবার জন্য এক জায়গায় সারি সারি আড়া পাতা। তাহার কাছে জেলেরা নিজেদের প্রয়োজনে সারি সারি কয়েকটা বাঁশ পুঁতিয়াছে। তাহার একটাতে একটা ফিঙা এবং আর একটাতে একটা মাছরাঙা পাখি বসিয়া আছে।

নিদাঘ-মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রাখর্য্য জলন্ধর বিলে একটু যেন প্রশান্ত হইয়া আসিয়াছে। কোথায় যেন একটা চিল ডাকিতেছে। আর ডাকিতেছে

ফটিক-জল—ফটি—ক জল। পাখিটিকে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিয়াছে। বিশালকায় জলন্ধর বিলের বিচিত্র সৌন্দর্য কিন্তু বাদল ডাক্তারকে মোটেই আকৃষ্ট করিতেছে না। এইমাত্র যে মুমূর্ষু রোগীটি তিনি দেখিয়া আসিলেন, তাহার কথাও তাঁহার মনে নাই। বাদল ডাক্তার ভাবিতেছিলেন, এবার মায়াকে কবিতায় একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়? হয়তো উত্তর দিতে পারে। বেশ সরস ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতার প্রথম লাইনটা কি হইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে উর্দ্ধশ্বাসে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ফোঁস্‌স্‌—

কল্পলোক হইতে সহসা কঠিন বাস্তবলোকে বাদল ডাক্তারকে নামিয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটা সাপ পাশের একটা ঝোপ হইতে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জলন্ধর বিলকে উপেক্ষা করিয়া অন্যমনস্ক লোকটা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া জলন্ধর বিলের আহত আত্মমর্যাদা যেন সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে।

বাইকের গতিবেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া ঝড়ের মতন বেগে বাদল ডাক্তার জলন্ধর বিল পার হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তার বলিষ্ঠ লোক। প্রচুর খাইয়া এবং দুপুরে ঘুমাইয়া যদিও একটু মোটা হইয়াছেন, কিন্তু একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়েন নাই। ঢিলা-হাতা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরিতে ভালবাসেন। এখনও তাহাই পরিয়া আছেন। পাঞ্জাবিতে হাওয়া ঢুকিয়া পিছন দিকটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাদল ডাক্তার দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। আহা, এ সময় পাশে যদি মায়া থাকিত! সাইড-কারটা খালিই রহিয়াছে।

জলন্ধর বিল পার হইলেই কালভৈরবের মাঠ, মাঠটা পার হইলেই

নালতে গ্রাম। নালতে গ্রামে হরিচরণ মাস্টার আছে, তাহার নিকট হইতে কাগজ যোগাড় করিতে হইবে। ফাউন্‌টেন-পেন সঙ্গেই আছে।

৭

বিরিঞ্চির গাড়ি যখন নালতে গ্রামে ঢুকিল, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে ঢুকিতেই যে ডোবাটা আছে, তাহাতে গোটা কয়েক মহিষ কাদা মাখিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তীরে গোটা দুই রাখাল বালক ডাং-গুলি খেলিতেছে। নালতে গ্রামের বিলু বাগদী কাঁধে জাল ফেলিয়া জলন্ধর বিলে মাছ ধরিতে যাইতেছিল, সে বিরিঞ্চিকে চিনিত, তাহারই মুখে বিরিঞ্চি শুনিল যে, বাবুরা ঠিক ইহার পরের গ্রাম শঙ্করাতে অবস্থান করিতেছেন। জম্‌জম নামক বদমেজাজী হাতীটার নাকি সত্য সত্যই মাথা-গরম হইয়া গিয়াছে। ঝাংরু গ্রামের পুষ্করিণীতে হাতীটাকে নামাইয়া স্নান করাইতেছে। মেজবাবুকে নামিতে হইয়াছে। শঙ্করা কাছারিতে ছোটবাবুর কাজ ছিল, তিনিও নামিয়াছেন। ভাইদের পিছনে ফেলিয়া বড়বাবু একা যাইতে রাজি হন নাই বলিয়া তিনিও নামিয়া পড়িয়াছেন।

পোদ্দারের দোকানটা খোলা আছে হে?

বিলু বলিল, আছে।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইয়া নালতে গ্রামের বিলাস পোদ্দারের দোকান অভিমুখে যাত্রা করিল। বিলু চলিয়া গেল।

গোহুমূর্না চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তাহার ডান গালটা রোদ লাগিয়াই সম্ভবত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বেশবাস বিস্রস্ত। নীল চোখ দুইটা জ্বলিতেছে।

বিলু চলিয়া গেলে বিরিঞ্চি ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ঝাংরুকে কিছু বলিস না, কেমন? তোর চুড়ি আমি কিনে দিচ্ছি এখানেই। বলবি না তো?

গোহুম্না নীরব।

বিরিঞ্চি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, কটা চুড়ি ভেঙেছে তোর?

চারটে।

এখুনি কিনে দিচ্ছি আমি, ওই যে পোদ্দারের দোকান খোলাই আছে দেখছি।

আর একটু আগাইয়া, রাস্তার পাশের ছোট মনিহারি দোকানটার সামনা-সামনি গিয়া বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইল।

গোহুম্নির হাতে যে চুড়িগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বিরিঞ্চি প্রশ্ন করিল, এমনই ধারা চুড়ি তোমার আছে নাকি হে পোদ্দার?

পোদ্দার বিরিঞ্চির বন্ধুলোক। গোহুম্নির দিকে এক নজর চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, আছে বইকি, কত চাই?

বেশি নয়, গোটা চারেক।

পোদ্দার হাসিমুখে দুই-তিন রকম মাপের লাল রেশমী চুড়ি বাহির করিল। গোহুম্না তাহার ভিতর হইতে চারিটি বাছিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি হাতে পরিয়া ফেলিল। ডান হাতে তিনটি এবং বাঁ হাতে একটি চুড়ি ভাঙিয়া গিয়াছিল।

বিরিঞ্চি বলিল, দাম কত?

দাম!

বিলাস পোদ্দার সম্মুখের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া এবং আ

একবার গোহুম্নার পানে চাহিয়া বলিল, ও চারগাছা চুড়ির আর কি দাম নোব তোমার সেঙাতনীর কাছ থেকে? সেটা কি ভাল দেখায়, কি বল তুমি?

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, তবে নিও না। তা হ'লে এবার চলি আমি।

আরে ভাই, একটু তামুক-টামুক খেয়ে যাও, নামই না!

না ভাই, বড় দেরি হয়ে গেছে। ফেরবার পথে নামব।

ভুলো না কিন্তুক।

আচ্ছা।

বিরিঞ্চি গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল।

গোহুম্না নীরবে বসিয়া রহিল।

নালতে গ্রাম পার হইয়া ছোট একটা মাঠ, তাহার পরই শঙ্করা গ্রাম। নালতে গ্রামের সীমান্তে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ পথটাকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। গাছের তলায় তলায় বিরিঞ্চির গাড়ি চলিয়াছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই।

হঠাৎ গোহুম্না বলিল, গাড়ি থামা, নামব আমি।

কেন?

জল-পিপাসা লেগেছে আমার।

গোহুম্না গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল।

বিরিঞ্চি গাড়ি থামাইয়া বলিল, এখানে জল পাবি কোথা?

তুই একটুকু দাঁড়া, আমি গাঁয়ের ভেতর থেকে এক ছুটে খেয়ে আসি। পালাস না যেন।

পালাব কেন?

না, পালাবি না! পুরুষ জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি! দেখি তোর গামছাখানা।

বিস্মিত বিরিঞ্চি বলিল, কেন ?

দেখি না।

বিরিঞ্চি কোমর হইতে গামছাখানা খুলিয়া দিল।

এইবার তোর হাত দুটো দেখি।

বিরিঞ্চিকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া গোহুম্নি গামছা দিয়া বিরিঞ্চির হাত দুইখানা বাঁধিয়া ফেলিল।

বিরিঞ্চি হাসিয়া বলিল, এ কি ?

আমার নিজের গামছা দিয়ে তোর পা দুটোও বাঁধব। পুরুষ লোককে বিশ্বাস আছে ? চোখের আড়াল হ'লেই পালিয়ে যায়।—বলিয়া সে সত্য সত্যই নিজের ছোট পুঁটুলিটি খুলিয়া গামছা বাহির করিল এবং বিরিঞ্চিকে আদেশের স্বরে বলিল, নে, পা দুটো জড়ো কর্ শিগগির।

বিরিঞ্চির মজা লাগিতেছিল। সে হাসিয়া পা দুইটা একসঙ্গে জড়ো করিয়া বসিল। গোহুম্না বেশ করিয়া তাহার পা দুইটাও বাঁধিল।

উঃ উঃ, লাগছে যে, কত জোরে বাঁধছিস ?

বেশ করিয়া গেরোর উপর গেরো দিয়া গোহুম্না বলিল, ব'সে থাক্ চুপ ক'রে।

তাহার নীল চক্ষু দুইটি সাপের চক্ষুর মত নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে।

বিরিঞ্চি বলিল, এমনই ক'রে ব'সে থাকব নাকি ?

থাক্ না, মজা পাবি।—বলিয়া গোহুম্না একটা ইট কুড়াইল এবং সেটা সজোরে গাছের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

গাছে প্রকাণ্ড একটা ভীমরুলের চাক ছিল।

শঙ্করা গ্রামের কাজল-দীঘি পুকুরে ঝাংরু জমজমকে নামাইয়াছিল। কয়েক দিন স্নান করানো হয় নাই বলিয়াই হাতীটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক জলে পড়িয়া থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। ঝাংরু হাতীর কাঁধ হইতে নামে নাই। সে ডাঙশ লইয়া নিজের স্থানটিতে ঠিক বসিয়া ছিল। ঘাড়ে সওয়ার হইয়া বসিয়া থাকিলে হাতীর বাবার সাধ্য আছে তাহাকে ফেলিয়া দেয়! এঁটুলি যেমন করিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, ঝাংরু ঠিক তেমনই ভাবে তাহার ঘাড়ে বসিয়া ছিল। হাতী ডুবিয়া যাইবার মত জল কাজল-দীঘিতে ছিল না। জম্‌জম শুঁড়ে করিয়া জল লইয়া নিজের মাথায় এবং ঝাংরুর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইতেছিল। তাহার ফোঁসফোঁসানি যদিও এখনও কমে নাই, কিন্তু জলে নামিয়া সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়াছে। মজা দেখিবার জন্য তীরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু ভিড় দেখিলে জম্‌জম পাছে আবার ক্ষেপিয়া উঠে, এইজন্য ঝাংরু তীরে কাহাকেও দাঁড়াইতে দেয় নাই। ঝাংরুর মানা সত্ত্বেও দুই-চারিটা ছোঁড়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন মজার সন্ধান না পাইয়া তাহারাও একে একে সরিয়া পড়িয়াছে। তীর এখন নির্জ্জন। অদূরে সারি সারি কয়েকটা তালগাছ দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া সশব্দে তাহাদের পাতাগুলিকে নাড়া দিয়া যাইতেছে। পাশের একটা ঝোপ হইতে একটা নেউল বাহির হইল, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, আবার ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাহির হইল এবং সেটাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েকটা বড় বড় প্রজাপতি ওধারের ঘেঁটুবনটায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জলের ধারে কতকগুলি ঘল্‌ঘসে ফুলের গাছ। শুঁড়ের মতন বাঁকানো ডালের উপর সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠিক তাহাদেরই কাছে ঘাস-পাতার জঙ্গলে জাল পাতিয়া একটি বিচিত্র রঙের মাকড়সা শিকারের আশায় ওত পাতিয়া আছে। অদূরে জীর্ণ শিবমন্দিরটার দুয়ার বন্ধ। কেহ কোথাও নাই।

জমৃজম ক্রমাগত শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া তুলিয়া মাথায় ঢালিতেছে। ঝাংরু তাহার কানে ডাঙশটা ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার মাথাটা পরিষ্কার করিয়া দিতেছে এবং হস্তীবোধ্য ভাষায় তাহার সহিত কি কথা বলিতেছে।

জমৃজম সহসা খুব জোরে ফোঁস করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোহুমনি পিছন দিক হইতে ঝাংরুকে জড়াইয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোহুমনি জলে নামিয়া পিছন দিক হইতে চুপিচুপি কখন হাতীতে চড়িয়াছে, ঝাংরু বুঝিতেও পারে নাই।

এ কি, তুই কোথা থেকে এলি ?

পালিয়ে এলাম।

কোথা থেকে ?

বিরিঞ্চির গাড়ি থেকে।

কেন ?

বাবা রে বাবা, যে ভীমরুল সেখানে !

ভীমরুল !

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ভীমরুল। নালাতে পেরিয়ে একটা আমগাছের তলা দিয়ে আসছি আমরা, এমন সময় তোমার বিরিঞ্চি লাঠি তুলে যেই তার গরুকে হাঁকাতে যাবে, লাঠি গিয়ে লাগল এক ভীমরুলের চাকে, গাছের নীচু ডালটায় বাসা ছিল তাদের।

তোর গালে কিসের দাগ ?

আমার গালে একটা বসেছিল এসে, আর একটু হ'লেই হুলটা ফুটিয়ে দিত।

ঝাংরু চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, তুই বিরিঞ্চি বেচারাকে অমন বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে এলি ? আচ্ছা লোক তো তুই !

ভীমরুলকে আমি বড্ড ডরাই বাপু।

গোহুম্‌নি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ঝাংরুও হাসিল।

জম্‌জম আর একবার ফোঁস করিয়া উঠিল

৮

শঙ্করা-কাছারিতে যে কাজটির জন্য ছোটবাবু নামিয়াছিলেন, সে কাজটি বেশ একটু জটিল-গোছের। কিছুদিন পূর্ব্বে জগাই ক্ষ্যাপা নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ শঙ্করা গ্রামে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন। এমন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে, শঙ্করা-কাছারির গোমস্তা দ্বারিক ঘোষাল সংবাদটা সদরে দাখিল না করিয়া পারেন নাই।

ছোটবাবু খবর পাঠাইয়াছিলেন যে, কলমিপুরে যাইবার মুখে তিনি শঙ্করায় নামিবেন এবং উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া যথোচিত বন্দোবস্ত করিবেন।

সিদ্ধপুরুষটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল খাড়া হইয়াছে। এক দলের মতে, সিদ্ধপুরুষ সত্যই সিদ্ধপুরুষ, নানারূপ গন্ধ বাহির করিয়া, ভবিষ্যৎবাণী করিয়া এবং আরও নানা রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করিয়া তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন; সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিপক্ষ দলে গ্রামের সমস্ত যুবকবৃন্দ জুটিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, পুরুষটি হাফ-বয়েল্‌ড বা হার্ড-বয়েল্‌ড যাহাই হউন, উঁহার মতলব সুবিধার নয়। মেয়েদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিবার হেতুটা কি? বাছিয়া বাছিয়া যুবতী মেয়েদের দ্বারাই গা-হাত-পা টিপাইবার

আধ্যাত্মিক অর্থ তো তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না! বুঝিতে চাহেও না। জমিদারবাবুরা যদি ইহার একটা বিহিত না করেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। মারের চোটে সিদ্ধপুরুষকে একেবারে 'ন্যাকোট' করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

সমস্যা গুরুতর। দ্বারিক ঘোষালের মুখে যাহা শুনা যাইতেছে, তাহাতে সিদ্ধপুরুষটি সত্যই একটু বিচিত্র ধরনের লোক। কুচকুচে কালো রঙ, ষণ্ডামার্ক চেহারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত পোশাক করিয়া থাকেন। মাথায় লম্বা চুল, নাকে নোলক, কাছা নাই, বুকে সর্ব্বদাই আঁচল টানিতেছেন। সখী ভাব! যুবকেরা ইহার প্রতি বিরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ প্রাচীন মাতব্বর ব্যক্তিই ইহার স্বপক্ষে। এমন কি ছাতিমপুর গ্রামের নামজাদা ঘুষখোর দারোগাটি পর্য্যন্ত ভক্তিতে গদগদ। সমস্ত শুনিয়া ছোটবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। যদিও তিনি যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে বড়বাবু, মেজবাবু কেহই একটি কথা বলিবেন না, তবু নিজের দায়িত্বে চট করিয়া একটা হুকুম তিনি দিতে পারিলেন না। ঘটনাটা বড়বাবুর গোচর করিলেন।

বড়বাবু সটকায় একটা টান দিয়া বলিলেন, কারও স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। ওই হিজড়ে-মার্কা সিদ্ধপুরুষ যদি এখানে থেকে সুখ পায় থাকুক, কেউ যদি স্বেচ্ছায় ওকে বাড়িতে স্থান দেয় দিক, কোন মেয়ে যদি ওর পা টিপে সুখ পায় পাক, আর ছোকরারা যদি সেজন্যে ওকে ধ'রে পিটতে চায় পিটুক, আর তুমিও যদি এ বিষয়ে কিছু একটা করতে চাও কর। আমার কাছে সবই সমান।—এই বলিয়া তিনি সটকায় পুনরায় একটা টান দিলেন।

নিকটেই লাহিড়ী বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভোট নাও। এই ডেমোক্র্যাসির যুগে সবই তো ভোট দিয়ে ঠিক হচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, ভোট! খুব সহজ বুদ্ধি বাতলালে তো! গাঁ-সুদ্ধ লোকের ভোট নিয়ে বেড়াতে হবে এখন! তখুনি তোমাকে বললুম, দু পেগ চড়িয়ে নাও, কি রকম যেন মিইয়ে পড়ছে আজ সকাল থেকে।

লাহিড়ী এই কথায় এমন একটা হাসি হাসিলেন, যাহার অর্থ— আপনি যে এ কথা বলিবেন, তাহা আগেই জানিতাম এবং আপনি ছাড়া এমন কথা কেই বা আর বলিতে পারে!

মুখে কিন্তু তিনি বলিলেন, সহজ বুদ্ধি একটা বাতলান তা হ'লে। আমাদের ছোটবাবু যে ফাঁপরে পড়েছেন।

সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ব্যাপারটা ছোটবাবুর হাতেই ছেড়ে দেওয়া।

বড়বাবু আবার সটকা তুলিয়া লইলেন। ছোটবাবু একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গেলেন মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু কাছারি-বাড়ির শীতলতম ছোট ঘরটিতে তাকিয়া ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। কোলের কাছে টোকনের বান্ধবী ও হরিশ খুড়োর নাতনী চাঁপা বসিয়া ছিল। এই ফুটফুটে মেয়েটি মেজবাবুর বড় প্রিয়। তাঁহার সহিত হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছে। টোকনও আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মেজ মা ওই দুরন্ত ছেলেকে হাতীর পিঠে আসিতে দেন নাই; মেজবাবু মুশকিলে পড়িয়াছেন, চাঁপা টোকনের জন্য ছটফট করিতেছে। কাছে থাকিলে যদিও দুইজনে ঝগড়া এবং কথা-কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই করে না, কিন্তু ছাড়াছাড়ি হইবারও উপায় নাই। এ বিপদ যে ঘটিবে, তাহা মেজবাবু জানিতেন। সেইজন্য টোকনকেও হাতীতে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মেজ গিন্নীর কথার উপর—

ছোটবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিয়া মেজবাবুর যৌবনকালের মেজাজটা ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি তাকিয়া ছাড়িয়া বিরাট দেহ লইয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, দ্বারিককে বল, হাঁকিয়ে দিক ব্যাটাকে। ওসব বুজরুকি-ফুজরুকি চলবে না এখানে। গোঁফের ওপর নোলক ঝুলিয়ে ধর্ম্মের নামে ভেলকি দেখাবার জায়গা এ নয়। দূর ক'রে দাও ব্যাটাকে।

ছোটবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মেজবাবু আবার ডাকিলেন, শোন শোন। তুমিই যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর গিয়ে। যত সব জোচ্চোরের আড্ডা হয়েছে এখানে।

ছোটবাবু চলিয়া গেলেন।

চাঁপা পুনরায় প্রশ্ন করিল, টোকন এখনও আসছে না কেন?

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেজবাবু বলিলেন, এই এসে পড়ল ব'লে।

এত স্নিগ্ধকণ্ঠে যে, কে বলিবে এই লোকটারই মেজাজ একটু আগে সপ্তমে চড়িয়াছিল!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ছোটবাবু শেষে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। দ্বারিক ঘোষালকে বলিলেন, এক কাজ কর তুমি, সিদ্ধ-পুরুষটিকে আমাদের সদরে নাটমন্দিরে চালান ক'রে দাও। সেখানে ভাল থাকবেন উনি। একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে কালই পাঠিয়ে দাও সেখানে। ওঁকে গিয়ে বল যে, আমরা ওঁর খ্যাতি শুনে মুগ্ধ হয়েছি এবং দেখা করতে চেয়েছি। এ কথা শুনলে উনি যেতে আপত্তি করবেন না। কলমিপুর থেকে ফিরে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আমি চক্রবর্ত্তী মশাইকেও ব'লে দিচ্ছি।

বাহিরের বারান্দাতে প্রবীণদলের মুখপাত্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছোটবাবু তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, আমাদের সকলেরই

ইচ্ছে যে, আমাদের নাটমন্দিরে বাবা একবার পদধূলি দেন। এখন তো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ ঘটল না, দ্বারিককে তাই ব'লে দিলাম, আমাদের ওখানে যাবার সব ব্যবস্থা যেন ও ক'রে দেয়। নাটমন্দিরে থাকবার কোন অসুবিধে হবে না। আমাদের সদর-নায়েব চৌধুরীও মহা ভক্ত লোক। সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে ওঁর। কালই একবার পাঠিয়ে দেবেন ওঁকে দয়া ক'রে।

চক্রবর্ত্তী সোৎসাহে বলিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, মহাপুরুষ লোক উনি, নিয়ে যাবেন বইকি আপনারা। মানী না হ'লে মানীর মান রাখবে কে?

চক্রবর্ত্তী ছাতা ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেলেন এবং নিজের দলকে গিয়া খবর দিলেন, বাবুরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে নিজেদের নাটমন্দিরে।

বিপরীত দিকের বারান্দায় ছোকরাদের মুখপাত্র বিপনে অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ছোটবাবু তাহাকে গিয়া বলিলেন, কালই ও গ্রাম থেকে চ'লে যাবে, সে ব্যবস্থা করেছি। তোমরা আর কিছু ব'লো না ওকে।

যে আজ্ঞে।

পুলকিত বিপিনও নিজের দলে গিয়া বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল, ছোটবাবু বললেন, কালই ব্যাটাকে কান ধ'রে গ্রাম থেকে বার ক'রে দেবেন।

হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো—

মেজ মা, তরঙ্গিণী, ঊষা, ঠানদি, ঠাকুরদা, সকলের পালকি আসিয়া পড়িল। অশ্বপৃষ্ঠে হীরেনও আসিল। কিন্তু সুরেনের আর মীনার

পাত্তা নাই। পালকির শব্দ পাইয়া মেজবাবু ও ছোটবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁপা ছুটিয়া গিয়া টোকনের গলা জড়াইয়া ধরিল। মেজ মা মেজবাবুকে নিরাপদ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তরঙ্গিণী ছোটবাবুর প্রতি একবার আড়চোখে চাহিয়া একটু হাসিয়া পালকির অন্তরালে আত্মগোপন করিল। ছোটবাবুর মুখে নয়—চোখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মেজ মা মেজবাবুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু সুরেন-মীনার জন্য পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হীরেন বলিল, কালভৈরবের মাঠে একটা খরগোশ দেখে সুরেন তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। সে এসে পড়বে এখুনি।

ঊষা বলিল, মীনাও এল ব'লে। ভয় কি, তার সঙ্গে তো নেহাল সিং আছে।

মেজ মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, পরের মেয়ে, ভালয় ভালয় এসে পৌঁছলে বাঁচি। যা রোদ উঠেছে, বেয়ারাগুলো হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আস্তে আস্তে আসছে।

ছোটবাবু ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আহা সত্যি, বড় কষ্ট বেচারাদের! বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেয়ারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এক দল পাংখা-বরদার ঠিক করলেই হ'ত, বেয়ারাগুলোকে হাওয়া করতে করতে আসত।

মেজ মা কোপ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, নিজেদের যদি বইতে হ'ত কাঁধে ক'রে, ঠাট্টা করা বেরিয়ে যেত তা হ'লে।

ছোটবাবু কাছারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

ঊষা পালকি হইতে বাহির হইয়া হীরেনের সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

মেজবাবু ঠাকুরদার পালকির নিকট গিয়া বলিলেন, ঠাকুরদা, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে যেন!

আমার মত অবস্থায় পড়লে তোমাকেও দেখাত।

কেন, কি হ'ল?

আমার একমাত্র গৃহিণীর একমাত্র কোমর বিপন্ন।

মেজবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, এর ভেতরও আপনি ঠানদির কোমর তদারক করবার অবসর পেয়েছেন? আশ্চর্য্য!

ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, তার চেয়েও আশ্চর্য্য যে, তোমরা এতদিনেও তোমাদের ঠাকুরদাটিকে চিনতে পারলে না।

মেজবাবু বলিলেন, হ'ল কি আপনার কোমরে?

পালকিতে ব'সে ব'সে কোমরে খিল ধ'রে গেছে ভাই। কোমরের সে জোর কি আর আছে?

তার জন্যে ভাবনা কি, আমাদের দ্বারিকও বেতো মানুষ, ওর কাছে নিশ্চয় মহামাস-টাস কিছু একটা আছে। দিচ্ছি যোগাড় ক'রে, দাঁড়ান।

ঠাকুরদা ব্যগ্রতার ভান করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দাও তো ভাই, কলমিপুরের মাঠে গিয়ে একটু মালিশ ক'রে দোব না হয়।

মেজবাবু হাসিয়া কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

ছোটবাবু পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং আড়চোখে একবার মেজ মায়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন।

মেজ মা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, বড়দিরা কি চ'লে গেছেন?

হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগেই গেলেন তাঁরা। মা তো রাস্তায় জলগ্রহণ করবেন না, সেখানে গিয়ে ময়না নদীতে নেয়ে আহ্নিক ক'রে তবে খাবেন কিছু। সেইজন্যে ওঁদের আর আটকালাম না। ওই যে, গরুর গাড়িগুলোও এসে গেল দেখছি।

দূরে রাস্তায় গরুর গাড়ির সারি দেখা গেল। বিরিঞ্চির গাড়ি ছাড়া বাকি নয়খানা গাড়ি আসিতেছে।

মেজ মা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, নতুন হাতীটা রাস্তায় কোন বদমায়েসি করে নি তো?

মেজবাবু বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই জবাব দিলেন, করেছিল একটু আধটু। ঝাংরু সেটাকে নাওয়াতে নিয়ে গেছে কাজল-দীঘিতে। মাথায় জল-টল পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বোধ হয়।

ছোটবাবু বলিলেন, তবু ওতে আর তোমার যাওয়া চলবে না, তুমি আমার হাতীতেই এস। চাঁপা না হয় কোন একটা পালকিতে উঠুক।

মেজ মা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

মেজবাবু কোন দিন ছোটবাবুর কথার প্রতিবাদ করেন না, নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, বেশ।

মেজ মা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, টোকন নাই।

টোকন কোথা গেল?

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওই যে, কাঠবেরালি-শিকার হচ্ছে।

কাছারি-বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছটায় অসংখ্য কাঠবেরালি লেজ ফুলাইয়া কিচকিচ শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে তাড়া করিতেছিল। তাহারই একটাকে টোকন এয়ারগান দিয়া লক্ষ্য করিতেছে। নিকটেই চাঁপা পাকা গিন্নীর মত ওষ্ঠ-ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভাবটা যেন—তুমি যা মারিতে পারিবে, আমি তা জানি। বরং বন্দুকটা আমায় দাও, কি করিয়া টিপ করিতে হয় দেখাইয়া দিতেছি।

মেজ মা হাসিয়া বলিলেন, তোমার শিকারী ছেলের জ্বালায় গেলাম বাবু।

ইহার উত্তরে ছোটবাবু কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন,

এমন সময়ে ঝড়ঝড়ে বাইকে চড়িয়া ব্যস্তসমস্তভাবে নীলু দত্ত আসিয়া হাজির।

মেজ মা ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া পালকির ভিতর অন্তর্হিতা হইলেন।

নীলু দত্ত বলিলেন, ভারি ভুল হয়ে গেছে একটা, লণ্ঠনের কথা মনেই ছিল না। দ্বারিক কোথা?

দত্ত মহাশয় বাইক হইতে নামিয়া বাইকটা ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারিক-বাবুর সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার কি দাঁড়াইবার অবসর আছে! একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এখানে আছে গোটা চারেক লণ্ঠন, ছাতিমপুরেও গোটা দুই পেয়েছি, দেখি নালতেতে যদি পাই কয়েকটা।

নীলাম্বর পুনরায় বাইকে সওয়ার হইতেছিলেন, এমন সময় ছোটবাবু বলিলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও।

নীলাম্বর দাঁড়াইলেন।

ওখানকার আর সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কটা তাঁবু গাড়ালে সবসুদ্ধ?

নটা। আপনাদের তিনটে, গিন্নীমার একটা, জামাইবাবুর একটা, হীরেনবাবুর একটা, চাকরানীদের একটা—

চাকরানীদের তাঁবুটার উল্লেখ করিয়া নীলু দত্ত চকিতে একবার ছোটবাবুর মুখের পানে চাহিলেন এবং বলিতে চাহিলেন, চাকরানীদের তাঁবুটা তাঁহার তাঁবুর কাছেই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কি মনে করিয়া আবার চাপিয়া গেলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, মোষের বাচ্চাটার কি হ'ল?

সেটাকে মেরেছে।

অ্যাঁ, বল কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লোকজন পাহারা বসিয়ে দিয়েছি সেখানে। মাচানও বাঁধিয়েছি তিনটে। আমি এবার যাই বাবু, অনেক কাজ বাকি এখনও—

ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি বাইকে উঠিয়া পড়িলেন।

দুই দিন কামানো হয় নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। মাথায় দুখে খাবছা খাবছা চুল উঠিয়া টাকটা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রোদে সমস্ত মুখখানা যেন পুড়িয়া গিয়াছে। নিদারুণ পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে এক দিনেই যেন নীলু দত্ত আরও দশ বৎসরের বুড়া হইয়া গিয়াছেন। খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল, এদিকে লাহিড়ীটা দিব্য বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া ইয়ারকি দিতেছে! লোকটার লজ্জাও নাই। মনে মনে লাহিড়ীর চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে নীলু দত্ত সবেগে নালতে অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। অন্তত আরও গোটা চারেক লণ্ঠন যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার ভিতরই ফিরিতে হইবে।

খানিকক্ষণ পরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না।

অশ্বপৃষ্ঠে সুরেন এবং মীনা!

দুইটি পা এক দিকে ঝুলাইয়া সঙ্কুচিত মুখে মীনা সামনে বসিয়া রহিয়াছে এবং সুরেনের বাম বাহুটি পিছনের দিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। নিকটে আসিয়াই মীনা নামিয়া পড়িল। সুরেনও নামিল। সহিসের হাতে লাগামটা দিয়া সুরেন আগাইয়া

আসিয়া হাসিমুখে এই যুগল আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা দিল, তাহাতে সকলেই খুশি হইলেন। ধাবমান শশকের পশ্চাতে কিছুদূর ছুটিয়া সুরেনকে অবশেষে হার মানিতে হইয়াছিল। কালভৈরবের মাঠে শশকটা মরীচিকার মত কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহা সুরেন ধরিতেই পারে নাই।

সুরেন বলিতে লাগিল, ফিরছি, কিছুদূর এসে ওই আপনাদের নালতে গ্রামটা পেরিয়েই কতকগুলো আমগাছ আছে, তার তলায় দেখি, মীনার পালকি। কাছে একটা গরুর গাড়িও রয়েছে। শুনলাম, গাছে নাকি একটা ভীমরুলের চাক ছিল, কি ক'রে তাতে খোঁচা লেগেছে, গাড়ির গাড়োয়ানটাকে কামড়েছে, মীনার পালকির দুজন বেয়ারাকেও কামড়েছে।

ছোটবাবু বলিলেন, বল কি? নেহাল সিং কোথা?

সে বেচারা ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে স'রে গেছল ব'লে বেঁচে গেছে, তাকে কামড়াতে পারে নি। সে আসছে পেছু পেছু।

মেজবাবু বলিলেন, তারপর?

আমি এসে দেখি, এই অবস্থা। গাড়ির গাড়োয়ানটা তো অজ্ঞান-প্রায়, বেয়ারা দুটো ছটফট করছে, মীনা পালকির দরজা বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে।

মেজ মা বলিলেন, কি বিপদ দেখ দিকি!

সুরেন বলিতে লাগিল, ভাগ্যিস আমি গিয়ে পড়লুম, তা না হ'লে মহা মুশকিলে পড়ত মীনা। তাও আবার ঘোড়ায় উঠতে চায় না কিছুতে। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তবে নিয়ে এলাম।

সুরেন হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে মীনার পানে চাহিল। মীনা সঙ্কুচিত হইয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

উষা এবং হীরেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্বামীর এই কৃতিত্বে উষা যেন অহঙ্কারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মীনার দিকে চাহিয়া বলিল, ঘোড়ায় চড়তে ভয় করে নাকি তোর? আচ্ছা ভীতু তো! আমাদের ও ঘোড়াটা খুব ট্রেনড, টোকন পর্য্যন্ত চড়ে ওর পিঠে।

মেজ মা প্রশ্ন করিলেন, গাড়োয়ানটার আর বেয়ারাগুলোর কি হ'ল?

স্বরেন বলিল, তারা আসছে। গাড়ির পেছনের দিকে পালকিটা চড়িয়ে দিয়েছি, গাড়োয়ানটা তারই ভেতর শুয়ে পড়েছে। সে বেচারাকে ভয়ানক কামড়েছে। একজন বেয়ারাই গাড়িটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাকি বেয়ারাগুলো হেঁটেই আসছে। নেহাল সিং সঙ্গে আছে।

মেজ মা বলিলেন, আহা বেচারীরা!

ছোটবাবু তাড়া দিলেন, যাক, সে যা হবার হয়েছে। চল, এইবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। মিছে দেরি ক'রে আর লাভ কি?

তাহার পর স্বরেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ওহে, তোমার 'কিল' হয়ে গেছে। এখুনি খবর পেলুম।

স্বরেন সোৎসাহে বলিল, তাই নাকি?

সকলে কলমিপুর মাঠের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মীনা আর উষা একটা পালকির ভিতর ঢুকিল।

৯

নালতে গ্রামে বন্ধু হরিচরণ মাস্টারের বাসায় বসিয়া বাদল ডাক্তার সত্যই একটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।—

নিদারুণ গ্রীষ্মকাল, আকাশেতে জ্বলিতেছে চিতা,
ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা হে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেবী,

ঘূর্ণমান পাংখাতলে, জানি আমি, তুমি নিপীড়িতা
কঠিন কর্ম্মের ভারে অথবা মর্ম্মের ভারে may be !
ক্লাস, ঘণ্টা, ছাত্রী, ফোন, মীটিং, রুটিন, সেক্রেটারি,
পরীক্ষার প্রশ্নাবলী, গার্জেনরা, কেরানী, চাপরাসী
রুদ্ধ করি মুক্ত বায়ু দাঁড়াইয়া আছে সারি সারি ;
ভিড় বাড়াইতে, দেবি, নাহি ইচ্ছা তার মাঝে আসি।
আমিও ঘর্ম্মাক্ত-দেহ, আর্দ্র ভুঁড়ি, শ্লথ নীবিবাস,
ঘর্ম্ম-বিচর্চ্চিকাগুলি চুলকাইয়া কাটাই দিবস ;
তথাপি চিন্তিত আমি—(নহে, দেবি, নহে পরিহাস)
না পাইয়া কোন বার্ত্তা চিত্ত মম সত্যই বিবশ।
চতুষ্পার্শ্বে জানি তব নানা কর্ম্ম করে গিজগিজ,
তবু ক্ষুদ্র অনুরোধ, দু লাইন চিঠি লিখো—please।

নিকটেই হরিচরণ উবু হইয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। গ্রামের মাইনর স্কুলের মাস্টার তিনি—অর্থাৎ সেই জাতীয় লোক, যাঁহারা স্কুল-পাঠ্য জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সন্দর্ভ জাতীয় বই এবং স্কুলের ইন্সপেক্টর, সেক্রেটারি জাতীয় লোক ছাড়া আর বিশেষ কোন কিছুর খবর রাখিবার অবসর পান না।

হরিচরণ নিরীহ ভালমানুষ লোক। বাদল ডাক্তার বিনা পয়সায় তাঁহার বাড়িতে চিকিৎসা করেন বলিয়া বাদল ডাক্তারের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার মনের খবরটিও জানেন। বাদল ডাক্তারের মনের খবর দুইজন লোক জানেন,—হরিচরণ মাস্টার এবং ছোটবাবু।

হরিচরণ কবিতাটি শুনিয়া উঠিয়া গিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন, খাসা হয়েছে !

তাহার পর হুঁকাটি কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া চীৎকার করিলেন,

ওরে মেধো, কোথা গেলি তুই? আঃ, একটা নেবু আনতে যুগ কাটাচ্ছে!

হরিচরণ বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাক্তারকে শরবত না খাওয়াইয়া কিছুতেই তিনি ছাড়িবেন না। কিছুক্ষণ পরে দুই গ্লাসে শরবত ঢালাঢালি করিতে করিতে তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন। মেধো নামক ছাত্রটিও পিছনে পিছনে নেবু-হস্তে প্রবেশ করিল। শরবত পান করিয়া বাদল ডাক্তার নিজের হাত-ঘড়িটা একবার দেখিলেন। কি সর্ব্বনাশ, চারিটা যে বাজে! আর তো বসিয়া থাকা চলে না। সন্ধ্যা নাগাদ কলমিপুরের মাঠে না পৌঁছিতে পারিলে ছোটবাবু কি মনে করিবেন!

হরি, তোমার কাছে একটা খাম আছে ভাই?

আছে।

দাও তো, এইখানেই পোস্ট ক'রে দিই চিঠিটা।

খামের উপর মায়ার ঠিকানাটা লিখিয়া বাদল সযত্নে কবিতাটি তাহার মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। যাইবার সময় পোস্ট অফিসে সহস্তে পোস্ট করিয়া যাইতে হইবে। অবিলম্বে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

১০

সন্ধ্যা হয় হয়।

সমস্ত দিনের গরমের পর ঝিরঝির করিয়া স্নিগ্ধ একটা হাওয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল নীল আকাশ। ঝাংরু গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে জমজমকে লইয়া কাঁকন নদী পার হইতেছে। পাগলা ঠাণ্ডা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে 'কাঁক' করিয়া শব্দ করিয়া গানের

তালে তালে ঠিক তাল দিতেছে। গোহুমনি ঝাংরুর পিছনে বসিয়া তাহার পিঠে গাল রাখিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া দুই-এক কলি গানও গাহিতেছে। মুখে অতি মৃদুমধুর একটি হাসি, চক্ষু দুইটি আবেশে নিমীলিত।

পূর্ব্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

প্রান্তরে

প্রথম দৃশ্য

কলমিপুরের মাঠে বড়বাবুর তাঁবু। তাঁবুটি বেশ বড়। দুইটি কক্ষ আছে, কক্ষ দুইটির মধ্যবর্ত্তী দ্বার পর্দ্দাবৃত। বড়বাবু যে কক্ষটিতে বসিয়া আছেন, তাহাতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। গোটা দুই ক্যাম্প-চেয়ার, প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া, দুইটি তেপায়া। একটি তেপায়ার উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক কোণে গোটা তিনেক সুটকেস অবছাভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁবুর সম্মুখের দরজাটা এবং দক্ষিণ দিকের বড় বড় বাতায়ন তিনটি উন্মুক্ত। দরজা দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর খানিকটা অংশ, কিছু দূরে দুইটি তাঁবু এবং আরও খানিকটা দূরে একটা জটলার মত দেখা যাইতেছে। বেহারা, মাহুত, গাড়োয়ান প্রভৃতি ভৃত্যগণ সেখানে গোল হইয়া বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছে। মাদলের আওয়াজ ও বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। বড়বাবু কেমন যেন একটু উন্মনা হইয়া একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি কার্পেটের উপর বসিয়া লাহিড়ী হার্মোনিয়াম সহযোগে "আমার দখিন দুয়ার খোলা"—গানটি আবেগভরে গাহিতেছেন। একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল এবং গড়গড়ার মাথায় কলিকাটি বসাইয়া নলটি বাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। বড়বাবু গান শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্কভাবে একটা টান দিলেন। কুঞ্চিত-ভ্রূ নীলু দত্ত দ্বারপ্রান্তে

সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। লাহিড়ীর গান ক্রমে শেষ হইয়া আসিল

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা ঠেলিয়া দিয়া] নাঃ, এখন বিটোফেনের মুন্‌লাইট সোনাটা ছাড়া আর কিছুতে জমবে না। অর্গানটা আনলেই হ'ত।

বড়বাবু গড়গড়াতে কয়েকটা টান দিলেন

বড়বাবু। অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খাঁটি দুধ প্রচুর রয়েছে, কেবল মুন্‌লাইট সোনাটা নামক দম্বলটির অভাব ?

বড়বাবু কথাটাকে এ ভাবে লইবেন, তাহা লাহিড়ী বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, মুন্‌লাইট সোনাটা বড়বাবুর প্রিয় জিনিস, সেইজন্যই কথাটা বলিয়াছিলেন। বড়বাবুর মন্তব্য শুনিয়া বুঝিলেন, কথাটা এখন বেফাঁস হইয়াছে ; সারিয়া লইবার জন্য সবজান্তাগোছ একটা হাসি হাসিলেন

লাহিড়ী। খাঁটি জিনিস থাকলে আর ভাবনা কি ? তেঁতুল দিয়েও জমিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে।

বড়বাবু গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন

বড়বাবু। খাঁটি জল জমাবার প্রক্রিয়া কিন্তু অন্য রকম শুনেছি।

লাহিড়ী চকিতে একবার বড়বাবুর মুখের পানে চাহিলেন। বড়বাবুর কথাবার্ত্তা আজ কেমন যেন বাঁকা বাঁকা ধরনের মনে হইতেছে

লাহিড়ী। [সহাস্যে] ঠিক ধরেছেন আপনি। সমাজ বলুন, পলিটিক্স বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই জলে জলময়।

বড়বাবু। [সহসা] বিটোফেন কালা এবং মিল্টন অন্ধ হয়ে গেছলেন, কেন জান ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য লাহিড়ী প্রস্তুত ছিলেন না। কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বড়বাবু নিজেই উত্তর দিলেন

ভগবান ওঁদের সহায় ছিলেন।

লাহিড়ী। [হার্মোনিয়ামটা টানিয়া লইয়া] এবার কি গাইব, বলুন? রবিবাবু তো হ'ল, নিধুবাবু ধরব একটা?

বড়বাবু। ও ভদ্রলোককে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

লাহিড়ী। তা হ'লে—

বড়বাবু। এই ফাঁকা মাঠে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় একটা প্যাঁকপেঁকে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বস্তাপচা কতকগুলো গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তো ওই কার্য্য ক'রে চলেছ, এখানেও ওই করবে?

লাহিড়ী। [স্মিতমুখে] সবই তো বুঝি, কিন্তু কি করব বলুন?

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] ও, কি করবে, তাও আমাকে বাতলে দিতে হবে! স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অভিনব ধরনে আনন্দপ্রকাশ করবার তাকত তোমার নিজের নেই?

লাহিড়ী চমৎকার একটি সঙ্কুচিত ধরনের হাসি হাসিলেন। ভাবটা—সত্যই নাই। বড়বাবু বলিয়া চলিলেন

মেতে ওঠ। এই বিশাল মাঠে, অনাবিল জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে যাও। একটি ফোঁটা মদ না খেয়েও নেশায় চুর হয়ে পড়, তবে না বুঝব, জ্যোৎস্নারসিক তুমি। এমন সময় তাঁবুর ভেতর ব'সে হার্মোনিয়াম প্যাঁকপ্যাঁক করার কোন মানে হয় তোমাদের বয়সে—অমন ফাঁকা মাঠ থাকতে?

ইহার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিয়া লাহিড়ী উঠিয়া পড়িলেন এবং বড়বাবু ঠিক যেন তাঁহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছেন, এমনই একটা মুখভাব করিলেন

লাহিড়ী। আমিও এতক্ষণ জাস্ট ওই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, যা ইচ্ছে করে, সব সময়ে তা করা যায় না, লজ্জা করে।

বড়বাবু। কি ইচ্ছে করছে তোমার? উলঙ্গ হতে? হও না।

লাহিড়ী। [সমস্ত দন্ত বিকশিত করিয়া] ঠিক তা নয়। ময়না নদীতে নৌকো বাইলে হ'ত। মানে—

বড়বাবু। বেশ তো, যাও না। নৌকো তো আছে শুনেছি একটা।

লাহিড়ী। [উল্লসিত হইয়া] আপনি আসছেন?

বড়বাবু। না। আমারও একটা স্বতন্ত্র যা-খুশি আছে এবং তা জল-বিহার করতে রাজি নয় আজ। তুমি যেতে চাও যাও।

একটু হাসিয়া লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। লাহিড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নীলু দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন বাহিরে ওত পাতিয়া ছিলেন

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] পেছন দিকের ছোট তাঁবুটায় সব ঠিক আছে।

বড়বাবু। কি ঠিক আছে?

নীলু দত্ত। [অপর কক্ষের পর্দ্দাটার পানে সচকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রায় চুপিচুপি] আমি আসবার সময় বাইকের পেছনে বেঁধে কয়েকটা শ্যাম্পেন এনেছিলাম। ভাবলাম—

বড়বাবু। ও। আচ্ছা, নীলমণিকে বল, এইখানেই নিয়ে আসুক।

নীলু দত্ত। [আর একবার পর্দ্দাটার পানে চাহিয়া] এইখানেই?

বড়বাবু। হ্যাঁ।

বিস্মিত নীলু দত্ত চলিয়া যাইতেছিলেন, বড়বাবু তাঁহাকে ডাকিলেন

শোন, ক বোতল এনেছ?

নীলু দত্ত। তা আছে কয়েক বোতল—গোটা ছয়েক।

বড়বাবু। লাহিড়ীকে ডেকে এক বোতল দিয়ে দাও। ময়না নদীর দিকে বেড়াতে গেছে ওরা।

নীলু দত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় দুই-একটা টান দিয়া স্বগতোক্তি করিলেন

নিছক জ্যোৎস্নায় ওর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ সে কথা বলবার সাহস নেই।

নীলু দত্ত। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হুজুর কি লাহিড়ীকে এক বোতল দিতে বলছেন?

বড়বাবু। হ্যাঁ, দাও ওকে একটা বোতল।

নীলু দত্ত। [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে, কাল দুপুর পর্য্যন্ত তো এখানে থাকতে হবে। বেশি তো আনি নি, মাত্র ছটি বোতল।

বড়বাবু গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া নীলু দত্তের পানে একবার চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ নীলু দত্তের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তিনি বলিলেন

যে আজ্ঞে, দিয়ে দিচ্ছি তা হ'লে।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ত্রস্ত নীলু দত্ত চলিয়া গেলেন। বড়বাবু গড়গড়ায় আরও দুই-একটা টান দিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দাটা সরাইয়া লছমনিয়া উঁকি দিল। বড়বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণপরেই পর্দ্দা সরাইয়া বড় বউ প্রবেশ করিলেন। সাজসজ্জা-বিলাসিনী বড় বউয়ের এই আবির্ভাবে বড়বাবুর মুখে একটু বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। আজ বড় বউয়ের সাজসজ্জা একটু নূতন ধরনের। পরনে অতি সাধারণ সুতির একখানা শাড়ি। অঙ্গে সোনার অলঙ্কার একখানিও নাই। হাতে সোনার চুড়ির বদলে লোহা এবং মোটা মোটা শাঁখা। গলাতেও শাঁখের হার। হাতে একটা পানের ডিবা, সেটা অবশ্য রূপার এবং কারুকার্য্যখচিত। বড় বউ প্রবেশ করিয়া আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিলেন। বড়বাবু নীরব বিস্ময়ে বড় বউকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন

বড় বউ। [আর একটু জরদা মুখে দিয়া] লছমনিয়া, জামাইবাবুর তাঁবুতে গিয়ে খবর দে, আসছি আমি এখুনি।

লছমনিয়া বাহির হইয়া গেল

বড়বাবু। [বড় বউয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হঠাৎ ঢাকনাটা খুললে যে?

বড় বউ। কিসের ঢাকনা?

বড়বাবু। তোমার নিজের। এতদিন গয়না-কাপড়ের তলায় যেন চাপা পড়েছিলে, দেখতেই পাই নি তোমায়।

বড় বউ কোন উত্তর দিলেন না। বড়বাবু আবার বলিলেন

তোমার যে এত রূপ ছিল, চোখেই পড়ে নি তা এতদিন।

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] তোমার চোখের বাহাদুরি সেটা।

বড়বাবু। বুঝতে পারলাম না।

বড় বউ। রূপ তো চোখে পড়বার জন্যে অহরহ উন্মুখ, রূপ চোখে পড়বার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন ভগবান ; চোখ যদি এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে চ'লে থাকে, সেটা তার বাহাদুরি বইকি। [ঈষৎ হাসিয়া] আজ তা হ'লে তো মুশকিল হ'ল, রূপটা চোখে প'ড়ে গেল। করকর করছে নাকি? জল এনে দোব একটু, ধুয়ে ফেলবে?

বড়বাবু। [হাসিয়া] সব জিনিস কি আর জল দিয়ে ধোওয়া যায়?

বড় বউ। ও, ভুলে গেছলাম। নির্জ্জলা জিনিস নিয়েই যে তোমার কারবার।

বড়বাবু স্মিতমুখে কিছুক্ষণ বড় বউয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

বড়বাবু। তোমার এ কথায় আমার চ'টে যাওয়া উচিত, কিন্তু কিছুতেই চটতে পারছি না তো!

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। চাকরেরা যেখানে জটলা করিতেছিল, সেখানকার বাঁশীর আওয়াজটা সহসা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—

বড় বউ। যাই এবার আমি।

বড়বাবু। জামাইয়ের তাঁবুতে যাচ্ছ কেন?

বড় বউ। যদি নিয়ে যায় আমাকে, আমিও গিয়ে মাচাতে বসব। হীরেন শুনছি যাবে না, সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে রোদ্দুরে এসে তার শরীরটা খারাপ হয়েছে। তার মাচাটা খালি আছে, তার বন্দুকটাও পাব।

বড়বাবু। [সবিস্ময়ে] তুমি বন্দুক চালাতে পার নাকি?

বড় বউ। পারি একটু একটু, অন্তত পারতাম এককালে। ছেলেবেলায় দাদাদের সঙ্গে শিকারে গেছি অনেকবার, তখন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। [মুচকি হাসিয়া] উড়ন্ত পাখিও মারতে পারতাম।

বড়বাবু। শুনি নি তো কখনও এ কথা! [একটু থামিয়া] প্রমাণও পাই নি।

বড় বউ। [বিস্ময়ের ভান করিয়া] এ বাড়িতে তার প্রমাণ দোব কি ক'রে? লাউ-কুমড়ো-শশা-সিমের জন্যে তো বন্দুকের দরকার নেই!

বড়বাবু ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন, এ কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঈষৎ-বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময়, কৌতুক মূর্ত্ত হইয়া উঠিল

বড়বাবু। ও, এ বাড়িতে টিপ করবার মত আমিষ কোন কিছু পড়ে নি বুঝি তোমার চোখে? ভারি দুঃখের বিষয় তো!

বড় বউ। [গম্ভীরভাবে] শুধু চোখে পড়লে কি হবে, রেন্‌জের মধ্যেও পড়া চাই।

বড়বাবু। বড় বড় শিকারীদের শুনেছি বন্দুকের রেন্‌জও বড়। বাঘ সিংহ মারতে হ'লে পাখি-মারা বন্দুকে চলে না তাদের।

বড় বউ। আমার বাঘ সিংহ মারতে ইচ্ছে করে না কোন কালে, পুষতে ইচ্ছে করে।

বড়বাবু। পুষলেই পার, সে আর বিচিত্র কি ?

বড় বউ। পাই কোথায় ?

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আবার বাঁশীর আওয়াজটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তুতুর তুয়া, তু—। বড় বউ আর এক খিলি পান ও আর একটু জরদা মুখে দিলেন

বড় বউ। এবার যাই আমি।

বড়বাবু। এখুনি বললে, বাঘ মারতে ইচ্ছে করে না তোমার, অথচ রাইফেল নিয়ে মাচানে বসতে যাচ্ছ, ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড় বউ। নিজের হাতে বাঘ মারতে প্রবৃত্তি নেই, বন্দুকটা নিচ্ছি আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু বাঘ-শিকার দেখবার একটা কৌতূহল আছে। বলিষ্ঠ হিংস্র জানোয়ারটা গুলি খেয়ে কেমন শেষ আর্ত্তনাদটা ক'রে ওঠে, সেইটে শোনবার লোভ আছে। আর কিছু নয়।

বড়বাবু নীরবে কিছুক্ষণ বড় বউকে নিরীক্ষণ করিলেন

বড়বাবু। তোমার যদি ছেলেমেয়ে না হ'ত, তা হ'লে তোমার নারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করতাম।

বড় বউ। ঝান্সির রাণী, রিজিয়া, এলিজাবেথ, ক্লিওপেট্রা—এদের কি তুমি নারী ব'লে মনে কর না ?

বড়বাবু কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে নীলমণি গলাখাঁকারি দিল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন। নীলমণি একটি কাঠের ট্রেতে এক বোতল শ্যাম্পেন, কয়েকটি ছোট কাচের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল এবং ট্রেটি তেপায়ার উপর রাখিয়া বড়বাবুর মুখের পানে চাহিল

বড়বাবু। থাক্, এখন দরকার নেই।

নীলমণি নীরবে বাহিরে চলিয়া গেল। বড় বউ পর্দা সরাইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন

মাচানে ব'সে শিকার করতে যাচ্ছ, অথচ নীলমণিকে দেখে লজ্জা!

বড় বউ। অনাবশ্যকভাবে আমি কখনও আত্মপ্রকাশ করি না কারও কাছে।

অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ঊষা আসিয়া প্রবেশ করিল

ঊষা। বাবা, নীলুকাকা কোথায়?

বড়বাবু। একটু আগে তো এসেছিল এখানে। কেন?

ঊষা। ওই বটগাছটায় একটা দোলনা টাঙিয়ে দেবে।

বড়বাবু। দোলনা এখানে পাবে কোথা সে?

ঊষা। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিলেই তো হবে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] বেশ বুদ্ধি বার করেছিস তো!

বড় বউ। সুরেন কি করছে?

ঊষা। জানি না।

বড় বউ। শিকারে যাবি না তুই?

ঊষা। না।

বড় বউ। চল্ না, একসঙ্গে সবাই গিয়ে একটা মাচায় বসা যাক। মীনা কোথা?

ঊষা। কি জানি, নদীর ধারে, না কোথায় বেড়াচ্ছে। আমি শিকারে যাব না। ওতে আর মজা কি? সারারাত মাচায় মুখটি বুজে

চুপটি ক'রে ব'সে থাক। তার চেয়ে নীলুকাকাকে ব'লে ওই বট-গাছটায় একটা দোলনা টাঙাই গিয়ে। বেশ মজা ক'রে দোলা যাবে। নীলুকাকা কোথা?

বড়বাবু। এই বাইরেই কোথাও আছে, দেখ্ না।

প্রায় ছুটিয়া উষা বাহির হইয়া গেল

বড়বাবু। [হাসিয়া] উষা উষাই র'য়ে গেল দেখছি, সকাল আর হ'ল না।

বড় বউ। আমিও যাই তা হ'লে।

বড়বাবু। যাও।

বড় বউ। আমাকে বাঘের মুখে পাঠিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করছ না তো?

বড়বাবু। [হাসিয়া] ইতস্তত ক'রে তোমার গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

বড় বউ। তুমি কি বলতে চাও, আজীবন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমি চলেছি?

বড়বাবু। তাই বা বলি কি ক'রে। অন্তত আজকের রাত্রে সে কথা বলা চলে না।

বড় বউ। মানে?

বড়বাবু। মানে, তোমার চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়নার বোঝাগুলো আজ আমারই পছন্দ অনুসারে সরিয়ে রেখেছ—এই ভেবে চিত্ত আমার খানিকটা বিনোদিত হচ্ছে। ধারণাটা যদি ভুলও হয়, ভেঙে দিও না সেটা।

বড় বউ। চকচকে কাপড় আর ঝকঝকে গয়না যে তুমি পছন্দ কর না, তা তো বল নি কোন দিন মুখ ফুটে।

বড়বাবু। মুখ ফুটে যেখানে বলতে হয়, সেখানে না বলাই ভাল। তা ছাড়া সত্যিকারের আভিজাত্য যার আছে, সে মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। [কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন] কিন্তু আজ জ্যোৎস্না মনোহারিণী, তোমাকেও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, আভিজাত্যের আগলটা তাই একটু আলগা হয়ে গেল হঠাৎ।

বড় বউ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন

বসলে যে ?

বড় বউ নির্নিমেষ নেত্রে বড়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না

বসলে যে, যাবে না ?

বড় বউ। [গাঢ় স্বরে] না। [একটু পরে] চল, আমরাও উষার মত একটা দোলনা টাঙিয়ে দুলি গিয়ে।

বড়বাবু। [হাসিয়া] সে আর হয় না বড় বউ। অপরাহ্ণ হাজার চেষ্টা করলেও আর উষা হতে পারে না।

একটু চুপ করিয়া রহিলেন

কিন্তু অপরাহ্ণেরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের স্থান এখন ভিড়ের মধ্যে নয়, নিভৃতে। একান্তে ব'সে রোমন্থন করাও কি কম বিলাস ? এখানে বসতে যদি চাও, চেয়ারটা আর একটু টেনে আন, আলোটা নিবিয়ে দাও।

বড় বউ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর আলোটা নিবাইয়া দিলেন। একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া উভয়ের কোলের উপর পড়িল। দুইজনে নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিলেন। দূরে বাঁশী বাজিতে লাগিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলমিপুর মাঠের একটি অংশ। এই স্থানটি তাঁবুগুলি হইতে বেশ একটু দূরে, এখান হইতে ময়না নদী দেখা যায় না। যতদূর দেখা যায়, ধু-ধু করিতেছে মাঠ। কেবল খানিকটা দূরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত বিরাট একটা বটগাছ অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই কাছে হাতী তিনটাও বাঁধা আছে। হাতীগুলি বটগাছের ডাল ভাঙিয়া ভাঙিয়া খাইতেছে, ডাল ভাঙার মটমট শব্দ পাওয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্নালোকে বিরাটকায় দাঁতাল হাতীটার প্রকাণ্ড দাঁত দুইটা অদ্ভুত দেখাইতেছে

এই অংশে একটি সুপরিসর শতরঞ্জি বিছানো, কয়েকখানা টিনের চেয়ারও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একটা চেয়ারে বসিয়া নীলু দত্ত তামাক খাইতেছেন। সম্মুখের একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর তিনি একটা পা তুলিয়া দিয়াছেন। নিকটেই অপর একটি চেয়ারে স্থূলকায় তিনু চাটুজ্জেও বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তেও হুঁকা। গোলগাল মুখমণ্ডল চিন্তাকুল। বাম জানুর উপর দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দিয়া পায়ের পাতাটি তিনি ঘন ঘন নাড়িতেছেন। সুন্দর হাওয়া বহিতেছে, চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নাবিষ্ট

তিনু। দাও হে এবার কলকেটা।

নীলু। দাঁড়াও হে বাপু, সমস্ত দিনের মধ্যে কি আর তামাক খেতে পেয়েছি, না পা মুড়ে বসতে পেয়েছি! এই তো একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি কেবল।

গোটা কয়েক টান দিলেন

তাও আবার উষা ঠাকরুণ দোলনা টাঙাবার এক ফরমাশ দিয়েছেন।

তিনু। দোলনা? দোলনা এনেছ নাকি?

নীলু। হাতীর হাওদা একটা টাঙিয়ে দিতে বলছে বটগাছে। বুদ্ধিও জোটে এদের মাথায়!

তিনু। [আঙুল দিয়া দেখাইয়া] ওই বটগাছটায়? ওখানে তো হাতী বাঁধা রয়েছে দেখছি।

নীলু। আরে না না, ওখানে নয়, ওদিক পানে আর একটা ছোটগোছের বটগাছ আছে। কিন্তু কাকে বলি এখন বল তো! [কয়েকটা টান দিয়া] চাকরবাকরগুলো সব মাদল নিয়ে মেতেছে, গোহুম্‌নি ছুঁড়ীটা নাচছে। এখন কাউকে বললে কি নড়বে সেখান থেকে কেউ!

বেশ জোরে আরও গোটা দুই টান দিলেন

ভিকুটা বোকাসোকা-গোছের আছে, দেখি, যদি সে ব্যাটাকে রাজি করতে পারি। এই নাও।

তিনুকে কলিকাটা দিলেন এবং পা সরাইয়া হুঁকাটা পাথরের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিলেন

তিনু। [কলিকাটি হুঁকায় বসাইতে বসাইতে] আজকাল ছোট-লোকেরাই সুখেতে আছে ভাই, বোয়েছ? ভদ্দরলোকদের আর ভদ্রস্থ নেই।

যেন অত্যন্ত মূল্যবান একটি উক্তি করিয়াছেন—এইরূপ মুখভাব করিয়া তিনি হুঁকায় একটি টান দিলেন

নীলু। ভদ্দরলোকই বা কটা আছে আজকাল? সব শালাই চামার। [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] ওই লাহিড়ীটাকে তুমি ভদ্দরলোক বল? তুই ব্যাটা যে বড়বাবুর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে শ্যাম্পেন খেতে চাস, এর আগে শ্যাম্পেন দেখেছিলি কখনও বাপের জন্মে?

তিনুর হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন

তিনু। অ্যাঁ, বল কি, শ্যাম্পেন খেতে চাইছে?

নীলু। চেয়েছে নিশ্চয়ই, তা না হ'লে বড়বাবু দিতে বললেন কেন?

কেউ কিছু চাইলে বড়বাবু 'না' বলতে পারেন না, এ কথা তো সবাই জানে। তাই ব'লে সব জিনিস চাইতে হবে?

তিনু পুনরায় হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন

নিজেরও তো আক্কেল থাকা উচিত একটা! তোর পেটে বোমা মারলে পান্তাভাত পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি বেরিয়ে পড়বে, তুই চাইলি শ্যাম্পেন খেতে!

তিনু চক্ষু বুজিয়া তন্ময় হইয়া তামাক টানিতেছিলেন, সংক্ষেপে উত্তর দিলেন

তিনু। বোঝ।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ

নীলু। আমাদের বড়বাবুর যে রকম দরাজ হাত, ছোটবাবুর হাতে জমিদারি না পড়লে উনি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অমন কাছাখোলা হ'লে জমিদারি থাকে!

তিনু চক্ষু খুলিলেন

তিনু। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করেছ ভাই। আমি এসে থেকে তক্কে তক্কে ঘুরছি, কিন্তু ছোটবাবুর নাগাল তো পাচ্ছি না। বড়বাবুকেই ধরব নাকি শেষ অবধি গিয়ে?

নীলু। সে পথও বন্ধ। বড়বাবু আজ রাত্রে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—হুকুম দিয়েছেন। তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিং কিরিচ বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তিনু। বড় ফ্যাসাদে পড়লাম তো তা হ'লে হে! শেষ পর্য্যন্ত তা হ'লে কি লছমনিয়াটাকেই তোয়াজ করতে হবে নাকি? সে ছুঁড়ীরও তো কোন পাত্তা পেলাম না। এই একটু আগেই দেখলাম, সে বড়বাবুর তাঁবু থেকে বেরিয়ে জামাইবাবুর তাঁবুর দিকে গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ছোটবাবুর তাঁবুর কাছে গিয়ে কি একটু ঘুজঘুজ করলে, তারপর এল এই দিক পানে। আমিও পেছু

পেছু এলাম। কি করি, কাজের নাম বাবাঠাকুর! ভাবলাম, আড়ালে একটু আভাস দিয়ে রাখি কথাটার। কিন্তু এখানে এসে ফট ক'রে কোথায় যে গা-ঢাকা দিলে, ধরতে পারলাম না। ওই তো এক ফোঁটা ছেলেমানুষ মেয়ে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে স'রে পড়ল!

হুঁকায় টান দিলেন। ধোঁয়া বাহির হইল না। কলিকায় ফুঁ দিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন

নীলু। [বিজ্ঞভাবে হাসিয়া] ছেলেমানুষ হ'লে কি হয় ভায়া, মেয়েমানুষ তো! সংস্কৃত শোলোকে আছে—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। এই ধর না, এতকাল ধ'রে এই এস্টেটে চাকরি ক'রে চুল পাকিয়ে যে ধারণাটি পাকা-পোক্ত ক'রে রেখেছিলুম, আজ এখানে এসে সেটি বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। দেখলাম, সবই ভুয়ো।

তিনু। কি রকম?

নীলু। এতকাল ধারণা ছিল, বড়বাবু বড় বউকে লুকিয়ে মদ খান। বড় বউ কড়া মেজাজের লোক, ওসব পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, বড়বাবু বড় বউয়ের সামনেই মদ নিয়ে যেতে বললেন, বড় বউ ছাড়া আর সকলকে, এমন কি নীলমণিকে পর্য্যন্ত, তাঁবু থেকে বার ক'রে দিলেন এবং হুকুম দিলেন তাঁর তাঁবুর সামনে নেহাল সিংকে পাহারা দিতে, যেন আর কেউ না যায় সেখানে। অথচ বড়বাবু যাতে একটু গোপনে মদ খেতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে আমাকে কি কম নাকালটা হতে হয়েছে!

তিনু। [হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া] এর মানে কি?

নীলু। মানে আবার কি, বড় বউয়ের লীলা! ওই যে বললাম—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা। মেজবাবু-ছোটবাবুর সম্বন্ধেও ঠিক একই ধরনের ঘা খেতে হ'ল আমাকে।

তিনু। কি রকম ?

হুঁকাতে গোটা দুই টান দিলেন, ধোঁয়া বাহির হইল না

নীলু। মেজবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা এক গেলাস ক'রে সিদ্ধি খান। বিশ্বম্ভরটা চিরকাল বৈঠকখানায় তৈরি করে; মেজবাবুও চিরকাল বৈঠকখানায় ব'সেই খান। আমার ধারণা ছিল, বুঝি মেজ মাকে লুকিয়েই খান। এখানেও সেই রকম ব্যবস্থাই রেখেছিলাম আমি। ওমা! এখানে এসে মেজ মা-ই সিদ্ধির সরঞ্জাম চেয়ে পাঠালেন। কাদম্বিনী এসে বললে, মেজ মা শিল নোড়া সিদ্ধি বাদাম পেস্তা গোলাপ-জল—সব চাইছেন, নিজের হাতেই আজ সিদ্ধি তৈরি করবেন তিনি। বোঝ একবার কাণ্ডটা, নিজের হাতেই তৈরি ক'রে দেবেন!

তিনু ধোঁয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হঠাৎ দূরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল

তিনু। কে যেন আসছে হে এদিকে;

নীলুও চাহিয়া দেখিলেন

নীলু। তালুকদার বোধ হয়।

তিনু। আর ছোটবাবুর সম্বন্ধে কি জানলে ?

নীলু। ছোটবাবুর তাঁবুর সামনাসামনি চাকরানীদের তাঁবুটা দিয়েছিলাম, কারণ আমার জানা ছিল—

তিনু। হ্যাঁ, সে তো জানি।

নীলু। ছোটবাবু এসেই আমাকে প্রচণ্ড এক ধমক—আমার তাঁবুর সামনে চাকরানীদের তাঁবু কেন ? ওদের অন্য তাঁবুতে দাও, ঠাকুরদা-ঠানদি ওখানে থাকবেন, আর ঠিক পাশের তাঁবুটায় থাকবেন বাদল ডাক্তার। [চোখ বড় বড় করিয়া] যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

তিনু। আসল ব্যাপারটা তা হ'লে কি? এ যে দেখি, সবই গোলমাল ক'রে দিলে তুমি!

খুব জোরে জোরে টান দিয়াও যখন আর ধোঁয়া বাহির করিতে পারিলেন না, তখন বিরক্ত মুখে হুঁকাটি নামাইয়া পাথরে ঠেসাইয়া রাখিলেন

নীলু। খুব সম্ভবত কিছু খিটির-মিটির হয়েছে ছুঁড়ীটার সঙ্গে। মেয়ে-মানুষের ব্যাপার—দেবা ন বুঝন্তি কুতো মনুষ্যা!

তিনু। ওর সঙ্গে খিটির-মিটির হ'লে আমি যে অকূল পাথারে পড়লাম হে! তা হ'লে—

এমন সময় উদ্‌ভ্রান্ত তালুকদার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে গাদা-বন্দুক, পরনে শিকারীর বেশ

নীলু। তুমি এখনও যাও নি যে?

তালুকদার ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকটা একবার দেখিয়া লইলেন। তাহার পর উত্তর দিলেন

তালুকদার। না, যাই নি এখনও, মানে—[সহসা] আচ্ছা, লছমনিয়াটা এসেছে এদিকে, দেখেছ?

তিনু। তোমারও খাজনা বাকি নাকি?

তালুকদার। খাজনা বাকি মানে?

নীলু। কেন, লছমনিয়াকে কি দরকার তোমার?

তালুকদার। মানে, গরুর গাড়িতে আসবার সময় আমার বন্দুকের খোলটা প'ড়ে গেছল, সে নাকি কুড়িয়ে রেখেছে। একবার খোঁজ করলে হ'ত।

নীলু। সে কাল সকালে খোঁজ ক'রো। এখন বন্দুকের খোলের কি দরকার?

তালুকদার। না, মানে—

তালুকদার আবার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন

নীলু। শিকারে যেতে চাও তো এখুনি বেরিয়ে পড়।

তালুকদার। তাই যাই। কিন্তু—, আচ্ছা থাক্, পরে হবে।

ইতস্তত করিয়া অবশেষে তিনি চলিয়াই গেলেন

তিনু। জামাই কি শিকারে বেরিয়ে গেছেন?

নীলু। বন্দুক কাঁধে ক'রে তো বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন ভগবানই জানেন।

তিনু। আর কে কে গেল?

নীলু। নিতাই আর হরু মণ্ডল আর বিলটা গেছে। তালুকদারও যাচ্ছে।

তিনু। বিলটা আবার কে?

নীলু। ও আমাদের এখানকারই একজন প্রজা, শিকারে ভারি ঝোঁক। ওকে একটা বন্দুক দিয়েছি, দেবদারুগাছে গিয়ে চড়েছে সে! [হাসিলেন] কিন্তু যেখানে 'কিল' হয়েছে, সেখানে বসে নি। ময়না নদীর চরের দিকে যে দেবদারুগাছটা আছে, সেইখানে বসেছে। ও বলছে, বাঘ আসবার ওইটেই রাস্তা।

তিনু। নিতাই বন্দুক পেলে কোথা? ওর নিজের তো এক মুখ ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। মুখেই রাজা-উজির বাঘ-গণ্ডার মারছে। কিন্তু সত্যিকার বাঘ তো আর মুখ দিয়ে মারা যাবে না!

নীলু। এস্টেটেরই বন্দুক দিলাম ওকেও একটা। অত উৎসাহ ক'রে এসেছে বেচারী। তবে নিতাইই বল, তালুকদারই বল, আর জামাইবাবুই বল, বাঘ মারতে পারবেন না কেউ। যদি কেউ পারে, ওই হরু মণ্ডলই পারবে। মাচান বন্দুক কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে। নিজের চকচকে বর্শাটি নিয়ে সোজা গিয়ে শিমুল-গাছে উঠে বসেছে। বাঘও আবার একটা নয় শুনছি, এখানকার

সাঁওতালগুলো বলছিল, একজোড়া আছে। একটা বাঘ আর একটা বাঘিনী।

তিনু। ওরে বাবা! এ অঞ্চলে এসে পড়বে না তো হে একটা ছিটকে-মিটকে!

নীলু। [হাসিয়া] তোমার আর ভয় কি, সাতটা বাঘেও তোমার কিছু করতে পারবে না।

তিনু। কেন, আমি মোটা ব'লে বলছ? [একটু চুপ করিয়া রহিলেন] ছুটতে পার আমার সঙ্গে তুমি? এই কলমিপুরের মাঠটা আমি এক দমে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারি, তা জান?

নীলু দত্ত কিছু বলিলেন না, স্মিত মুখে নিজের মাথার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দূরে শোনা গেল, কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে

তাহাদের গান ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—

"জ্যোৎস্নাহসিত নীল গগনে বিহগ যখন গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে
তখন স্মরণে বাজে কাহার মৃদুল মধুর বাণী
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।"

নীলু। পরিষ্কার জোৎস্না উঠেছে আজ।

তিনু। তা বটে।

কুঞ্জলালের দল নিকটবর্ত্তী হইতেই তিনু চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িলেন এবং কাপড়ের কসিটা গুঁজিলেন

তিনু। আমি চললাম ভাই। ওসব ছেলেছোকরাদের কাছ থেকে স'রে থাকাই ভাল। নিজের মান নিজের কাছে।

নীলু। হ্যাঁ চল, আমিও যাই। আমাকে আবার দোলনাটা টাঙাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসাদ কি এক রকম!

উভয়ে চলিয়া গেলেন। কুঞ্জলালের দল গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িল, এবং গান থামাইয়া কেহ চেয়ারে কেহ শতরঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। বঙ্কু শতরঞ্চির

উপরই একটু দূরে গিয়া বসিল

হাবুল। আর গান নয় মাইরি। প্রচুর চেঁচানো হয়েছে।

বীরেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলি ?

কুঞ্জ। কি ?

বীরেন। আমরা আসতেই তিনু চাটুজ্জে আর নীলু দত্ত উঠে গেল।

কুঞ্জ। ভারি ব'য়ে গেল আমাদের।

বীরেন। তা তো বটেই, সে কথা বলছি না। কিন্তু এই খোলা মাঠে এসেও সবাই মিলে মিশে যে একটু ফুর্তি করবে, সে মেণ্টালিটি কারও নয়। এখানেও সবাই নিজের নিজের গণ্ডি আঁকড়ে প'ড়ে আছেন। আমাদের ডাক্তারবাবুটিও তাঁবুতে ঢুকেছেন।

পাঁচু। ইচ্ছে করলে আমরাও একটা তাঁবু পেতে পারতাম। চাকররা যে তাঁবুটা নিয়েছে, ছোটবাবুকে বললে, ওটা ঠিক আমাদেরই দিয়ে দিতেন।

বীরেন। ও রকম তাঁবু পাওয়ার চেয়ে খোলা মাঠে প'ড়ে থাকা ঢের ভাল।

শতরঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল

কুঞ্জ। নিশ্চয়।

হাবুল। আচ্ছা বীরেন, সূর্য্যের আলো গায়ে লাগলে সেদিন তুই বলছিলি কি যেন—

বীরেন। আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রে।

হাবুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রে নাকি শরীরের খুব উপকার

করে? চাঁদের আলোতে সে রকম কিছু নেই? যদি থাকে তো বল্, গেঞ্জিটা খুলে বসি।

বীরেন। তুই আল্ট্রা-ইডিয়ট, তাই এ কথা জিজ্ঞেস করলি। চাঁদের কি নিজের কোন আলো আছে?

হাবুল। ও, নেই নাকি? থাক্, তা হ'লে গেঞ্জিটা আর খুলব না।

পাঁচু। চাঁদের নিজের আলো থাক্ আর নাই থাক্, ফিনিক ফুটিয়ে ছেড়েছে কিন্তু মাইরি।

হাবুল। কুঞ্জ, তুই তোর বাঁশীটা বার ক'রে সেই ভীমপলশ্রীখানা আলাপ কর্, বেড়ে জমবে এখন।

পাঁচু। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, এইখানেই সব জমায়েত হয়ে বসা যাক মাইরি, অন্য কোথাও আমাদের ঠিক খাপ খাচ্ছে না। চাকর-বাকরদের ভেতরও গিয়ে বসা যায় না, বাবুদের তাঁবুতেও ঢোকা যায় না, এইখানেই ভাল। জায়গাটিও বেশ নিরিবিলি আছে।

হাবুল। বীরেন রাজি হ'ল না, কিন্তু চাকরবাকরদের মধ্যে বসলে সময়টা কাটত ভাল। গোহুম্‌নিটা যা নাচছে— দারুণ।

বীরেন। বড় ভাল্গার টেস্ট হয়ে গেছে তোর হেবলো।

হাবুল দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল

পাঁচু। দেখ্ দেখ্, বঙ্কা কেমন মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে!

কুঞ্জ। বেচারীর বউয়ের জন্যে মন-কেমন করছে বোধ হয়।

পাঁচু। [আবৃত্তির সুরে]

হে বঙ্কু, আকাশে চেয়ে ভাবিতেছ কি তাকে?
পায়ে যার লাল আলতা, নোলক দোলে নাকে?

বঙ্কু পাঁচুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল

হাবুল। এই পাঁচা, বিরক্ত করছিস কেন ওকে? না না বঙ্কা, তুই ভাব্। কুঞ্জ, তুই শুরু কর্।

পাঁচু মুখে কাপড় চাপা দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিল। কুঞ্জ বাঁশীতে ফুঁ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভীমপলশ্রী জমিয়া উঠিল, সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল

হাবুল। [সহসা] ওটা কি বল্ তো—দেখ্ দেখ্!

পাঁচু। কই?

হাবুল। ওই যে রে, বটগাছের কাছটায়—ওই আবার ঢুকে পড়ল।

বীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বল্ দেখি ওটা?

কুঞ্জ মুখ হইতে বাঁশী নামাইল

কুঞ্জ। বটগাছের ভেতর ঢুকে পড়ল, বলিস কি?

হাবুল। মাইরি বলছি, কি যেন একটা সাদাগোছের!

কুঞ্জ। ভূত-টুত নয় তো? এই বঙ্কা, এদিকে স'রে এসে ব'স্। মাত্র সেদিন বিয়ে করেছিস তুই, তোর কিছু হ'লে মনস্তাপের সীমা থাকবে না আমাদের। এদিকে স'রে আয়।

হাবুল। ঠাট্টা নয় মাইরি, সত্যি আমি দেখলাম, কি যেন একটা ঢুকে পড়ল।

বীরেন। আমিও দেখেছি।

পাঁচু। আমি দেখতে পেলাম না মাইরি, গিয়ে দেখে আসব?

হাবুল। [ভ্যাঙাইয়া] গিয়ে দেখে আসব! হুজুকে কোথাকার!

কুঞ্জ। যাক না, দেখে আসুক না, ব্যাপারটা কি!

পাঁচু। যাই। হাবুল, তুই সুদ্ধু চ ভাই।

হাবুল। আমাকে ঘাঁটিও না ব'লে দিচ্ছি।

বীরেন। তুই একাই যা না। তুই তো সব পারিস।

পাঁচু উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার মুখে বঙ্কুর মাথায় একটা ঠোক্কর দিয়া বটগাছটার দিকে আগাইয়া গেল। সকলে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। একটু পরেই পাঁচুকে আর দেখা গেল না, গাছটার নিকটে গিয়া অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইয়া গেল

বীরেন। অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ!

কুঞ্জ। চমৎকার!

হাবুল। দেখছিস না, বঙ্কা পর্য্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে! বঙ্কুকে ঘায়েল করা একটু আধটু জ্যোৎস্নার কর্ম্ম নয়।

বীরেন। কুঞ্জ, তুই বাজা, থামলি কেন?

কুঞ্জ। কি বাজাব, ফের ভীমপলশ্রী?

বীরেন। না। "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজা।

কুঞ্জ "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" বাজাইতে শুরু করিল। একটু পরে এমন জমিয়া উঠিল যে, হাবুল মুখ সুচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল, বঙ্কুর ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সেও গানটা মনে মনে গাহিতেছে। বীরেন গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে উন্মনাভাবে সুদূরপ্রসারী মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক স্বপ্নাতুর। পাঁচুর কথা সকলে যখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, এমন সময় দূরে পাঁচুকে দেখা গেল, সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে আসিয়া পড়িল

পাঁচু। ওরে, ও গানটা নয়। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স" বাজা।

কুঞ্জ বাঁশী থামাইল

কুঞ্জ। কিছু দেখতে পেলি?

হাবুল। কি দেখলি?

পাঁচু। [হাবুলের প্রতি] এখন 'কি দেখলি', বলব কেন তোকে? তখন ডাকলাম, আসা হ'ল না।

হাবুল। দেখ পাচা, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

পাঁচু হঠাৎ বঙ্কুকে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া শতরঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল

পাঁচু। উঃ, মাইরি মাইরি, বঙ্কু রে, তুই যদি দেখতিস!

কুঞ্জ। কি দেখলি, বল্ না?

পাঁচু। বটগাছের ঝুরির ভেতর ফুলঝুরি।

কুঞ্জ। ভূত নয়?

পাঁচু। ভিকু আর লছমনিয়া।

হাবুল। বলিস কি?

পাঁচু। মাইরি বলছি।

এমন সময় ঝড়ঝড়ে বাইক করিয়া নীলু দত্ত হঠাৎ আসিয়া হাজির হইলেন

নীলু। ভিকু চাকরটা এদিকে এসেছে? দেখেছ তোমরা কেউ?

পাঁচু। আজ্ঞে না।

নীলু। কোথা গেল ব্যাটা তা হ'লে?

কুঞ্জ। এই খানিক আগে সে তো ছোটবাবুর তাঁবুর দিকে গেল দেখলাম।

নীলু। আরে, সেইখান তেকেই তো আসছি আমি।

কুঞ্জ। আমি কিন্তু দেখলাম, সে ওই দিকেই গেল।

নীলু। ঠিক দেখেছ তুমি?

কুঞ্জ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলু। পাগল ক'রে মারলে ব্যাটারা আমাকে! এই দিগন্ত মাঠে কে যে কোথায় স'রে পড়েছে, ধরতেই পারছি না কাউকে।

নীলু দত্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাইক করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি একটু দূরে গেলে সকলে সমস্বরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

তৃতীয় দৃশ্য

মেজবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও বড়বাবুর তাঁবুর মত দুই-কক্ষবিশিষ্ট। ইহার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া শুধু জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীটাই নয়, নদীর উপর পাল-তোলা ছোট একখানি নৌকাও দেখা যাইতেছে। চাকরেরা যেখানে হুটলা করিতেছে, সে অংশটা অপেক্ষাকৃত নিকটতর হইলেও দেখা যাইতেছে না। কারণ সেদিকের বাতায়নগুলি সমস্ত বন্ধ। তথাপি নাচের, মাদলের এবং বাঁশীর আওয়াজ বেশ শোনা যাইতেছে। শ্রোতাদের কলরবগুঞ্জনও কিছু কিছু ভাসিয়া আসিতেছে। তাঁবুর ভিতর মেজ মা একটি ছোট টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া একটি শ্বেত পাথরের গ্লাসে সিদ্ধি ঢালিতেছেন। টেবিলে একটি চকচকে পানের বাটা, একটি প্লেটে অনেকগুলি সন্দেশ এবং একটি গ্লাস-ঢাকা ছোট কুঁজো রহিয়াছে। অপর কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা টাঙানো। পিছনের একটা দ্বার দিয়া তোয়ালেতে মাথা মুছিতে মুছিতে মেজবাবু প্রবেশ করিলেন। এইমাত্র তিনি স্নান সমাপন করিয়াছেন

মেজবাবু। কই, আমার গেঞ্জিটা দাও।

মেজ মা। [চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জিটা লইয়া দিলেন] এই যে, নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, প'রো না এখন, পিঠময় যে জল, মুছিয়ে দিই।

মেজবাবুর হাত হইতে তোয়ালেটা লইয়া পিঠ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং মেজবাবু পিঠ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

নাও এইবার।

মেজবাবু গেঞ্জিটা পরিলেন ও একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন

মেজবাবু। আঃ, চান ক'রে বাঁচা গেল। কি প্রচণ্ড গরমই ছিল আজ!

মেজ মা একটি অ্যাটাচি কেস হইতে চিরুনি বাহির করিলেন ও মেজবাবুর চিবুক ধরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন। মেজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

মেজ মা। গরম ব'লে গরম, সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে গেছে আজ! তার ওপর তুমি এসেছ হাতীতে!

মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। মেজ মা পরিপাটীরূপে মাথাটি আঁচড়াইয়া দিয়া টেবিলের নিকটে গেলেন ও সিদ্ধির গ্লাসটি আনিয়া হাতে দিলেন

খেয়ে দেখ দিকি, তোমার বিশ্বম্ভরের মত পেরেছি কি না!

মেজবাবু। [এক চুমুক পান করিয়া] চমৎকার! ওর চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।

মেজ মা। [সহাস্যে] আর যাই কর, বুড়ো বয়েসে মিছে কথাটা আর ব'লো না।

মেজবাবু। না না, সত্যিই চমৎকার হয়েছে।

ঢকঢক করিয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন

মেজ মা। [তোয়ালেটা আগাইয়া দিয়া] মুখটা পোঁছ।

মেজবাবু মুখটা মুছিলেন, গোঁফজোড়াতে তা দিলেন এবং মেজ মার মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন

নাও, এবার এগুলো খেয়ে ফেল।

সন্দেশের প্লেটটা আগাইয়া দিলেন

মেজবাবু। অতগুলো পারব না। পাগল নাকি!

মেজ মা। খেতে কত রাত হবে তার ঠিক আছে! এখনও পোলাও চড়ে নি।

মেজবাবু। তা না চড়ুক, তবু অতগুলো পারব না।

মেজ মা। যা পার খাও না, কটাই বা আছে ওতে!

মেজবাবু আর প্রতিবাদ না করিয়া খাইতে শুরু করিলেন

ওরে কাদু!

পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া কাদম্বিনী বাহির হইল

উষা, টোকন আর চাঁপাকে ডেকে নিয়ে আয়।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল, মেজবাবু নীরবে আহার করিতে লাগিলেন, মেজ মা চুপ করিয়া রহিলেন। বাহিরের নাচের শব্দটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। গোহুম্‌নির পায়ের ঘুংুর বাজিতেছে—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম। মাদল এবং বাঁশীও পুরাদমে চলিয়াছে

মেজ মা। উঃ, কি গুলতানিই করছে ওরা!

মেজবাবু স্মিত মুখে মেজ মার মুখের পানে চাহিলেন

মেজবাবু। চল, আমরাও কিছু একটা করি।

মেজ মা। কি করবে?

মেজবাবু একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া মেজ মার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, যেন মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়াছে

মেজ মা। বলছ না যে?

মেজবাবু। চল, দুজনে জম্‌জমের পিঠে চ'ড়ে একটা চক্কর দিয়ে আসি।

মেজ মা। পাগল নাকি! আমি হাতীতে চড়তে পারব না।

মেজবাবু। হাতীতে চড়া কি আর এমন মুশকিল, সিঁড়ি দিয়ে তো হাওদায় চড়বে!

মেজ মা। না না, ছি, সে কি হয়! মা, বটঠাকুর—এঁরা সব রয়েছেন, জানতে পারলে কি বলবেন!

এইরূপ উত্তরই যে মেজবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মুখভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন ও আর একটি সন্দেশ মুখে ফেলিলেন। মেজ মা কুজা হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া মেজবাবুর নিকট রাখিলেন এবং পানের বাটা খুলিয়া পান সাজিতে লাগিলেন। বাহিরে আনন্দকলরব আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল

মেজ মা। হাতীতে যে চড়তে বলছ, মাহুতরা তো সব হুল্লোড় করছে, নিয়ে যাবে কে?

মেজবাবু। কেন, আমি। এ অঞ্চলে আমার চেয়ে ভাল মাহুত আর কেউ আছে নাকি? ভুলে গেলে সব?

মেজ মা। ভুলেছি বইকি!

তিনি সস্নেহে বিরাটকায় বলিষ্ঠদেহ মেজবাবুর দিকে হাস্যমুখে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন

তোমার গোঁয়ার্তুমির জন্যে কি কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আমাকে! কিন্তু এ বয়েসে আর ওসব নয়।

মেজবাবু কিছু বলিলেন না, আর একটি সন্দেশ তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন

তা ছাড়া, ও পাগলা হাতীর পিঠে কে চড়বে বাপু?

মেজবাবু। পাগলা ব'লেই তো মজাটা আরও বেশি। ভাব তো একবার, বিরাট মাঠে বিরাট জ্যোৎস্নায় বিরাট জন্তুমের পিঠে চ'ড়ে চলেছি দুজনে। তোমার সর্ব্বদাই ভয় করছে, এই বুঝি ক্ষেপল, আমি নির্ব্বিকার ব'সে আছি, কারণ আমি জানি—পাগলা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মেজ মা। পাগলা বুঝি আবার ঠাণ্ডা হয়?

মেজবাবু। হয় না? প্রমাণ পাও নি তুমি তার?

স্নিগ্ধ হাসিতে মেজ মার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল

মেজ মা। না, দরকার নেই। বড় ভয় করে আমার।

কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল

কাদম্বিনী। ওরা কেউ আসছে না মা, উষাদিদি আর হীরেনবাবু দোলনাতে দুলছেন, টোকন আর চাঁপা জগদেও পাঁড়ের কাঁধে চেপে কোথায় বেড়াতে গেল, কিছুতেই এল না।

মেজ মা। [সক্রোধে] পাঁড়েটার কি রকম আক্কেল, ওদের না খাইয়ে

নিয়ে চ'লে গেল বেড়াতে! তুই আবার যা, উষাকে আর হীরেনকে ডেকে নিয়ে আয়, বল্‌গে, মেজ মা ভয়ানক রাগ করছেন।

কাদম্বিনী চলিয়া গেল

অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, না আছে লজ্জা, না আছে শরম। মা যা বলেন, তা ঠিকই। তরঙ্গিণীর ভাইটিও জুটেছে তেমনই।

মেজবাবু কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে একটির পর একটি সন্দেশ গম্ভীরভাবে আহার করিতে করিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, প্লেটে আর একটিও সন্দেশ নাই। গম্ভীর মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। প্লেটটি সরাইয়া দিয়া মেজ মার মুখের পানে চাহিলেন। প্লেট শূন্য দেখিয়া মেজ মার মুখখানিও প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

এই যে বললে, খেতে পারব না?

মেজবাবু। তোমাকে খুশি করবার জন্যে না পারি কি?

জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ বাহিরের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল। ঘুঙুর বাঁশী এবং মাদলের শব্দ ছাপাইয়া একটা বিশ্রী গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মেজবাবু গ্লাস হাতেই উঠিয়া পড়িলেন ও জানালার পর্দাটা সরাইয়া দিলেন। দূরে জ্যোৎস্নালোকে নৃত্যপরা গোহুম্নাকে দেখা গেল। এক হাত কোমরে এবং এক হাত মাথায় দিয়া নাচিতেছে। খোঁপার বেলফুলের মালাটা যে বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই; তাহার ডান দিকে ভিড়ের মধ্যে যে বিশ্বম্ভর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, সেদিকেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বিশ্বম্ভর কিন্তু খুব চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে এবং চার-পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। মেজবাবু বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিলেন

এই বিশ্বম্ভর, এদিকে আয়।

পর্দাটা ফেলিয়া দিলেন ও এক নিশ্বাসে জলটা পান করিয়া ফেলিলেন। ওদিক দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বম্ভর আসিয়া প্রবেশ করিল

ওখানে কি করছিলি?

বিশ্বম্ভর। গোহুম্‌নি ছুঁড়িটা হুজুর, আমাকে ভেংচে দিলে। মেরে ধুনে দোব ওকে আমি।

মেজবাবু। চুপ ক'রে ব'সে থাক্ বাইরে। সব জায়গায় গুণ্ডামি!

বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ নিরীহ ভালমানুসটির মত বা হবের দরজার পাশে চুপ করিয়া বসিল

মেজ মা। এই নে, একটু সন্দেশ খা, কেন যে গোঁয়ার্ত্তুমি করিস!

খানিকটা সন্দেশ তাহাকে দিলেন, সে হাত পাতিয়া লইল ও কোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া খাইতে লাগিল

মেজ মা। পর্দ্দাটা ফেলে দিলে কেন? তুলে দাও, দেখি ওদের নাচ। এই নাও পান।

বাটা হইতে পান বাহির করিয়া মেজবাবুকে দিলেন, মেজবাবু পানটা মুখে ফেলিয়া দিয়া পর্দ্দাটা তুলিয়া দিলেন। গোহুম্‌নি আত্মহারা হইয়া নাচিতেছে। তাহার ঘুঙুরের ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম, মাদলের ধিতাং তিনা ধিতাং তিনা, এবং বাঁশীর তুতুব তুয়া সমস্ত জ্যোৎস্নাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। মেজ মা চিত্রাপিতবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মেজবাবু একটা ক্যাম্প-চেয়ার টানিয়া তাহাতে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। দ্বারপথে দেখা গেল, উষা ও হীরেন আসিতেছে, পিছনে কাদম্বিনী। হীরেন হাতের সিগারেটটায় গোটা দুই টান মারিয়া সেটা ফেলিয়া দিল। নাচ বাঁশী ও মাদলের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। একটু পরেই উষা, হীরেন ও কাদম্বিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী আসিয়াই পর্দ্দা সরাইয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেল

উষা। মেজ মা, ডাকছ তুমি আমাদের?

মেজ মা। [ফিরিয়া] হ্যাঁ, দয়া ক'রে খেয়ে আমাকে রেহাই দাও মা।

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হীরেনকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন

উষা। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

মেজ মা। না ইচ্ছে করলেও খাও, তোমার আবার কবে খেতে ইচ্ছে করে! [হীরেনের প্রতি] তুমিও ভাই, খাও দুটো।

হীরেন। [স্মিত মুখে] দিন।

উষা। যখনই মেজ মা সন্দেশের হাঁড়ি এনেছেন, তখনই জানি, না শেষ হওয়া পর্যন্ত কারও নিস্তার নেই।

মেজ মা। [সন্দেশ বাহির করিতে করিতে] বেশ বেশ, তোকে খেতে হবে না, তুই যা।

উষা। বাঃ রে, আমি খাব না বললাম বুঝি, আমি তো শুধু বললাম, খেতে ইচ্ছে করছে না।

উষা ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেজ মা তাহার পানে বোষকটাক্ষে একবার চাহিয়া এক প্লেট সন্দেশ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। হীরেনকেও এক প্লেট দিলেন। উষা গপগপ করিয়া নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিল এবং হীরেনকে তাড়া দিল

শিগগির খেয়ে নিন। দোলনা খালি পেলে কেউ না কেউ দখল ক'রে বসবে। ছোট মা একবার খবর পেলে হয়!

মেজ মা। কাদু!

কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিল

ছোটবাবুর তাঁবুতে দিয়ে আয় কিছু মিষ্টি, এই নে।

একটি প্লেটে করিয়া মিষ্টি দিলেন, কাদম্বিনী তাহা লইয়া চলিয়া গেল

হীরেন। [প্লেটটা নামাইয়া দিয়া] এ দুটো আর পারব না মেজদি, অনেক দিয়েছিলেন।

মেজ মা। সুরেন কি শিকারে বেরিয়ে গেছে?

হীরেন। এখনও ঠিক মাচানে গিয়ে ওঠে নি বোধ হয়। ওই যে, ওই নৌকোটায় বেড়াচ্ছে ওরা।

নদীবক্ষে যে পাল-তোলা পানসিটা ভাসিতেছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল

মেজ মা। ওরা মানে, কে কে ?

হীরেন। মীনাও আছে। সুরেন তো উষাকেও নিতে চাইলে, কিন্তু উষা কিছুতে গেল না।

উষা। নৌকোয় চুপচাপ ব'সে থাকতে ভাল লাগে বুঝি ? তার চেয়ে দোলনা ঢের ভাল।

হীরেন। মীনাকে একটু ঘুরিয়ে নামিয়ে দিয়ে তারপর সুরেন মাচানে গিয়ে বসবে বোধ হয়। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা তো সব চ'লে গেছে। এখুনি একটু আগে তালুকদার মশাইও গেলেন।

মেজ মা। তুমি যাবে না ?

হীরেন। আমার শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। দেখি, এক কাপ কফি খেয়ে যদি ভাল লাগে, যাব। বাঃ, এখানে এরা বেশ জমিয়েছে তো।

খোলা জানালাটার কাছে আগাইয়া গিয়া নাচ দেখিতে লাগিল। মেজ মাও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন

উষা। [মেজবাবুর গায়ে হাত দিয়া] মেজকা, ঘুমোচ্চ ?

মেজবাবু। [চোখ খুলিয়া, স্মিত হাস্য সহকারে] না।

উষা। চমৎকার দোলনা টাঙিয়েছি আমরা।

মেজবাবু আর একটু হাসলেন। উষা হীরেনের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে লাগিল

কই, আপনি চলুন, এখানেই যে দাঁড়িয়ে পড়লেন !

হীরেন। দাঁড়াও না, একটু দেখে নিই।

উষা। তবে আপনি থাকুন, আমি যাই।

রাগে গরগর করিতে করিতে উষা চলিয়া গেল। উষা চলিয়া গেলে একটু হাসিয়া হীরেনও তাহার অনুসরণ করিল। মেজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া চেয়ারে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। মেজ মা তাঁহার দিকে চকিতে একবার চাহিয়া আবার

জানালায় দাঁড়াইয়া গোহুম্‌নির নাচ দেখিতে লাগিলেন। নাচ, বাঁশী এবং মাদল উদ্দাম তুনে চড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মেজ মা আর একবার মেজবাবুর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন। মেজবাবু ঠিক তেমনই ভাবে শুইয়া আছেন

মেজ মা। কই, হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু নীরব

ঘুমোচ্ছ নাকি?

মেজবাবু। না, ঘুমোই নি।

মেজ মা। হাতীতে বেড়াতে যাবে বললে যে?

মেজবাবু। তোমার যখন ইচ্ছে নেই, তখন থাক্‌।

মেজ মা। বেশ তো, চল না, যাই।

মেজবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে ভরিয়া গেল

মেজবাবু। এই বিশ্বম্ভর, জম্‌জমের পিঠে হাওদা দিয়ে নিয়ে আসতে বল্‌। সিঁড়ি আনতে বলিস, আর ঝাংরুকে বল্‌ তার ডাঙশটা আমাকে দিয়ে যেতে। আমিই চালাব। তুইও লাঠিটা নিয়ে সঙ্গে চল্‌।

বিশ্বম্ভর। যে আজ্ঞে।

সোৎসাহে উঠিয়া চলিয়া গেল

মেজবাবু। আমি জানতাম, তুমি ঠিক রাজি হবে।

আদুরে আবদেরে ছেলের অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিয়া জননী যেমন প্রসন্ন মুখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, মেজ মা ঠিক তেমনই করিয়া মেজবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

ময়না নদীর তীরে প্রস্তরাকীর্ণ একটা অংশ। ছোট বড় নানা আকারের কালো কালো পাথর ইতস্তত ছড়ানো আছে। প্রকাণ্ড চ্যাটালো চওড়া একখানা

পাথর ঠিক ময়না নদীর উপরই রহিয়াছে। ময়না নদীর স্রোত ছলাং ছলাৎ করিয়া তাহাতে লাগিতেছে। হরিশ খুড়ো একাকী নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নদীর বাঁকের মুখে জ্যোৎস্নাকিরণ অপূর্ব্ব স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছে। সেই দিকেই চাহিয়া খুড়ো তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বন্ধু তালুকদার শিকারে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার গল্প শুনিবার লোক কেহ নাই। তাই তিনি আপন মনে একা নদীর তীরে বসিয়া কল্পনার জাল বুনিতেছেন। এমন সময় জগদেও পাঁড়েকে দেখা গেল। তাহার এক কাঁধে টোকন এবং আর এক কাঁধে চাঁপা। পাঁড়ে উচ্চৈস্বরে ভজন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে

হরি দরশনকি পিয়াসী (আঁখিয়া)
দেখন চাহত কমল নয়ন
নিশরাতদিন উদাসী—(আঁখিয়া)
কেশর তিলক মোতিয়নকি মালা
বৃন্দাবনকে বাসী (আঁখিয়া)
সুর শ্যাম প্রভু আশ চরণকি
লইহো করবট কাশী (আঁখিয়া)
কেউ কা মন হায় কেউ না জানত
লোগনকে মন হাসি (আঁখিয়া)

পাঁড়ে হরিশ খুড়োকে দেখিয়া থামিল এবং চাঁপা ও টোকনকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী একটি পাথরে উপবেশন করিল

পাঁড়ে। খুড়াজী, এখানে এক্কারা কি হোচ্চে ?

হরিশ। চুপচাপ ব'সে আছি ভাই।

চাঁপা। [টোকনকে জনান্তিকে] দাদু খুব ভাল গপ্পো বলতে পারে। তুই গিয়ে বল্ না, তুই বললে ঠিক বলবে, আমি বললে ধমক দেবে।

টোকন আগাইয়া গেল

টোকন। একটা গপ্পো বল না দাদু !

চাঁপা। [আগাইয়া আসিয়া] দাদুকে বিরক্ত করছিস কেন ? দেখেছ দাদু, টোকনের স্বভাব ?

পাঁড়ে। হাঁ হাঁ, ছোড়েন একঠো মজেদার গপসপ।

চাঁপা। দাদুর যদি ইচ্ছে হয়, তবে দাদু বলবে, কি বল দাদু ?

আঙুলে কাপড়ের আঁচলটা জড়াইতে জড়াইতে আড়চোখে দাদুর দিকে চাহিতে লাগিল

হরিশ। [স্মিত মুখে] গল্প ? কিসের গল্প ?

পাঁড়ে। বাঘ, ভাল, রাছস—আপনি তো কেতো জানেন, ছোড়েন কোই একঠো।

হরিশ জ্যোৎস্নালোকিত ময়না নদীর পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন

হরিশ। আচ্ছা, শোন তবে। ভাল ক'রে ব'স সব।

সকলে হরিশ খুড়োকে ঘিরিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিল

হরিশ। অনেক অনে—ক দিন আগে এক দেশে এক রাজকন্যে ছিল। রাজকন্যে তো রাজকন্যে! কি তার রূপ! টুকটুকে রঙ, কুচকুচে কালো একমাথা চুল, ছোট ছোট সাদা মুক্তোর মত দাঁত, পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা টানা চোখ—

চাঁপা। কি নাম ছিল তার ?

হরিশ। তবেই তো বিপদে ফেললে দিদি, নাম তো ঠিক মনে নেই।

টোকন। নাম নিয়ে কি হবে, রাজকন্যে নামই তো বেশ নাম।

চাঁপা। [হাসিয়া উঠিল] রাজকন্যে বুঝি আবার নাম হয় কারও! কিচ্ছু বুদ্ধি নেই টোকনটার, দেখছেন দাদু ?

হরিশ। তা তো দেখছি, নাম তার ছিলও একটা, দাঁড়াও ভাবি ; [ভাবিয়া] মনে পড়েছে, নাম ছিল তার চম্পাবতী।

টোকন। তারপর ?

হরিশ। তারপর—দাঁড়াও, বিড়িটা ধরাই আগে।

বিড়ি ধরাইলেন

পাঁড়ে। দিন হামাকে ভি একঠো।

হরিশ খুড়ো জগদেওকেও একটা বিড়ি দিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরাইয়া দিলেন

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। তারপর একদিন হ'ল এক কাণ্ড।

টোকন। কি?

হরিশ। রাজকন্যে চম্পাবতী ভোরবেলা উঠে নিজের বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় পূব দিক রাঙা ক'রে সূর্য্যদেব উঠছেন। দুজনে চোখোচোখি হয়ে গেল। সূর্য্যদেব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, কি আশ্চর্য্য, মানুষেরও এমন রূপ হয়, এমন দুধে-আলতায় গোলা রং, এমন টুকটুকে, এমন ফুটফুটে—চমৎকার তো! ভাব করতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন ডিউটির সময়, আকাশ থেকে নেবে আসা মুশকিল।

হরিশ খুড়ো খুব চিন্তিত মুখে বিড়িতে একটি টান দিলেন

টোকন। সূর্য্যদেব আকাশ থেকে নাববে কি ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে?

চাঁপা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

চাঁপা। টোকনটার বুদ্ধি দেখেছেন দাদু, আকাশ থেকে নাবতে দেবতাদের বুঝি সিঁড়ির দরকার হয়!

টোকন। না হ'লে নাববে কি ক'রে?

পাঁড়ে। দেওতারা সোব কুছ পারে ভাই।

টোকন। তারপর?

হরিশ। তারপর সেদিন সমস্ত দিন তো কেটে গেল, সূর্য্যদেব আকাশ

থেকে নাবতে পারলেন না। কিন্তু মনটি প'ড়ে রইল তার পৃথিবীর দিকে। রাত্তিরে করলেন এক মজার কাণ্ড।

চাঁপা। কি?

হরিশ বিড়িতে আবার একটি টান দিলেন

হরিশ। রাত্তিরে রাজকন্যে চম্পাবতী দুধের মত সাদা ধপধপে বিছানাটিতে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে ছিল। সেদিন ঠিক এই আজকের মত জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নায় দশ দিক ভেসে যাচ্ছে। বাগানের প্রকাণ্ড পুকুরটায় অসংখ্য কুমুদফুল ফুটেছে, জানলার নীচে জুঁইফুলের ঝাড়টায় ফুলের সে কি ভিড়! হঠাৎ চম্পাবতীর মনে হ'ল, ভয়ানক গরম লাগছে। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় এত গরম কেন? ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী।

টোকন। [রুদ্ধশ্বাসে] কেন?

চাঁপা। আঃ, চুপ কর্ না তুই।

পাঁড়ে। হাল্লা মৎ মাচাও ভাই, শুনো না!

হরিশ খুড়ো চিন্তিত মুখে বিড়িতে টান দিলেন

হরিশ। ঘরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল চম্পাবতী। পশ্চিম দিকের জানলাটায় টাঙানো ছিল নীল রেশমের একটা পর্দ্দা, আর ঠিক সেইখানটাতেই জলছিল সোনার পিলসুজে স্ফটিকের একটা প্রদীপ। চম্পাবতী দেখলে, প্রদীপের লম্বা শিখাটা হয়ে গেছে পয়সার মত গোল, আর তার থেকে বেরুচ্ছে টকটকে লাল জ্যোতি—ঠিক যেন নীল পর্দ্দাটার গায়ে ছোট্ট একটা সূর্য্য উঠেছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল চম্পাবতী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। তারপর সূর্য্যদেব কথা কইলেন। বললেন, ভয় পেও না রাজকন্যে চম্পাবতী, আমি আকাশের সূয্য, তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি। চম্পাবতী বললে, তুমি সূয্য! তা হ'লে অতটুক কেন? সূর্য্য তো অনেক বড়। সূয্য বললে—

ছোট্ট তুমি চম্পাবতী রাজকন্যে লো
ছোট্ট হয়ে তাই এসেছি তোর জন্যে লো।

এস, দুজনে ভাব করি। আমিও টুকটুকে, তুমিও টুকটুকে। চম্পাবতী বললে, তোমার সঙ্গে ভাব করব না। সূর্য্য বললে, কেন? চম্পাবতী বললে, তুমি এলেই জ্যোৎস্না চ'লে যায়, জ্যোৎস্না আমার ভারি ভাল লাগে। এখন কেমন বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। তুমি এলেই তো সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি এস না, এখন তুমি যাও।

টোকন। রাজকন্যেটা তো ভারি দুষ্টু!

চাঁপা। বাঃ রে, দুষ্টু কেন হতে যাবে? ওর যদি ওর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে না হয়, জোর ক'রে ভাব করতে হবে তবু? কি বলেন দাদু?

পাঁড়ে। আরে শুনো না ভাই চুপসে সব। খালি কলর বলর কলর বলর!

হরিশ। সূর্য্যও বললে, ও কথা বলতে নেই রাজকন্যে চম্পাবতী, অতিথিকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিতে আছে! ছি! চম্পাবতী, একটু ভাবলে, তারপর বললে, বেশ, তা হ'লে আমাদের অতিথিশালায় চল তুমি, অতিথিরা সেইখানে থাকেন। সূর্য্য বললে, তোমার পুতুলরা যেখানে আছে, সেইখানে নিয়ে চল না আমায়। চম্পাবতী বললে, তা হ'লেই হয়েছে, তুমি গেলেই তো সব উঠে পড়বে, যা কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি ওদের! সূর্য্য তখন বললে, বেশ,

তা হ'লে অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চল আমাকে। তোমাদের অতিথিশালায় যাব না, সেখানে কত দেশের রাজা-রাজড়া অতিথি রয়েছেন, হোমরা-চোমরা লোক দেখলে বড্ড ভয় করে আমার।

টোকন। তারপর?

হরিশ বিড়িতে একটা টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন

হরিশ। তারপর চম্পাবতীর মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। বললে, বেশ, খুব নিরিবিলি জায়গাতেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি, চল। এই না ব'লে রাজকন্যে চম্পাবতী স্ফটিকের প্রদীপটি তুলে নিয়ে নীলাম্বরী শাড়ির আঁচলের আড়ালে ঢেকে এক চোর-কুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। চোর-কুঠরির কোণে প্রদীপটি রেখে বললে, তুমি এইখানে থাক, আমি আসছি এক্ষুনি। এই ব'লে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে শেকল তুলে চোর-কুঠরিটি বন্ধ ক'রে দিলে। সূর্য্যদেব হয়ে রইলেন বন্দী।

চাঁপা। তারপর?

হরিশ। রাত আর পোয়ায় না। রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন। তারপর?

হরিশ। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

পাঁড়ে। উস্‌কা বাদ কি হোলো?

হরিশ। তারপরও ওই—মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের

পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না। ওই যে, দেখ না!

হরিশ খুড়ো আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—দূরে ময়না নদীর বুকে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে

চাঁপা। রাজকন্যে চম্পাবতী কই?

হরিশ। চোখ বুজে ফেল, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

হরিশ খুড়ো চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

রাজকন্যে চম্পাবতী তার ধপধপে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে লাগল। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না আর ফুরোয় না।

টোকন, চাঁপা, জগদেও তিনজনেই চোখ বুজিয়া ব'সিয়া রহিল

পঞ্চম দৃশ্য

ছোটবাবুর তাঁবু। এ তাঁবুটিও অন্য তাঁবুগুলির মত। গোলমুনিদের নাচের আসর এ তাঁবুটির আরও কাছে। এখন নাচ-গান থামাইয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছে। মৃদু কলরব ছাড়া আর কিছু শোনা যাইতেছে না। সমস্ত জানালাগুলি, এমন কি তাঁবুর দ্বার পর্যন্ত বন্ধ বলিয়া বাহিরের কিছু দেখাও যাইতেছে না। এ তাঁবুতেও আসবাবপত্র অন্য তাঁবুগুলির মত, প্রচুর নয়, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আছে। টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলিতেছে, বেশ একটু জোরেই জ্বলিতেছে। তরঙ্গিণী একটা টিনের চেয়ারের উপর পা দুইটি তুলিয়া একটা ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে চাপা হাসি। ছোটবাবু মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঘরে আর কেহ নাই।

তরঙ্গিণী। পায়ে হাত দিচ্ছ, পাপ হবে আমার কিন্তু।

ছোটবাবু। হোকগে, কিছু কিছু পাপ হওয়া ভাল।

তরঙ্গিণী। কেন?

ছোটবাবু। আমি তো নির্ঘাত নরকে যাব জানি। নরকে গিয়ে মহা ফাঁপরে প'ড়ে যাব, তোমাকে যদি না পাই সেখানে। গোড়ালিটা তোল।

তরঙ্গিণী গোড়ালি তুলিলেন

তোমার নীলাম্বরী শাড়িখানা এনেছ তো?

তরঙ্গিণী। এনেছি। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

ছোটবাবু। আজ নিজের হাতে তোমাকে সাজাব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

ছোটবাবু। দেখব।

তরঙ্গিণী। তারপর?

মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গালে টোল পড়িল

ছোটবাবু। [তাঁহার দিকে এক নজর চাহিয়া] তারপর কি করব আর ভাবতে পারছি না। গোড়ালিটা তোল না ভাল ক'রে!

তরঙ্গিণী। আর কত তুলব! এই তো তুলেছি!

গোড়ালিটা আর একটু তুলিলেন, ছোটবাবু ঘাড়টা আরও নীচু করিয়া গোড়ালিতে আলতা পরাইয়া দিতে লাগিলেন

ছোটবাবু। এর পর কি করব, সত্যিই সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

তরঙ্গিণী। চল না, বেড়াইগে দুজনে।

ছোটবাবু। পায়ে হেঁটে?

তরঙ্গিণী। সবাই তো বেড়াচ্ছে।

ছোটবাবু। তুমি কি আর সবাইয়ের মত?

তরঙ্গিণী। আহা!

ছোটবাবু। বেড়াতে হ'লে ঘোড়া নিয়ে বেরোতে হয়। ধু-ধু মাঠে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি দুজনে দুটো ঘোড়ায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি—

তরঙ্গিণী। ঘোড়ায় চড়তে যে জানি না।

ছোটবাবু। তবে আর বেড়াবার শখ কেন? পায়ে হেঁটে হোঁচট খেতে খেতে বেড়ানোর কোন মানে হয় এমন রাতে? এমন রাতে বেড়াতে হ'লে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে হয়। কানের পাশ দিয়ে হু-হু ক'রে হাওয়া ব'য়ে যাবে—

তরঙ্গিণী হঠাৎ পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন

ও কি?

তরঙ্গিণী। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। বাদল ডাক্তারের মোটর-বাইকটা নিয়ে চল যাই। ওর তো সাইড-কারও আছে।

ছোটবাবু। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু ওর যা ফটফট আওয়াজ, গাঁ সুদ্ধু লোক জেনে যাবে—ছোটবাবু ছোট বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

তরঙ্গিণী। জানলেই বা।

ছোটবাবু। তোমার মত স্ত্রীকে নিয়ে ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় বেরনোটা উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করারই সামিল তো! সেটা ভদ্রতায় বাধে।

তরঙ্গিণী। তা হ'লে আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।

ছোটবাবু। কি?

তরঙ্গিণী। ব্যাটাছেলের পোশাক প'রে নিলে কি হয়? ধুতি পাঞ্জাবি আর মাথায় পাগড়ি? কেউ চিনতে পারবে না।

ছোটবাবু। বাঃ, চমৎকার হয় তা হ'লে। তাই চল, যাওয়া যাক। আমার পাঞ্জাবি কি তোমার গায়ে হবে?

তরঙ্গিণী। পাঞ্জাবি একটু ঢিলে হ'লে কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া একটু ঢিলেও দরকার।

মুচকি হাসিলেন, গালে টোল পড়িল

ছোটবাবু। কই, বার কর তো দেখি একটা পাঞ্জাবি।

তরঙ্গিণী। ওমা, আমাদের সুটকেসটা আবার মায়ের তাঁবুতে দিয়ে দিয়েছে ভুল ক'রে। আনতে বলব বলব ক'রে ভুলে গেলাম। তুমি তো কালীর মা, ভিকু সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে, এখন আনে কে গিয়ে?

ছোটবাবু। আমি না হয় নিয়ে আসি।

তরঙ্গিণী। আহা!

মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তরঙ্গিণী চলিয়া গেলে ছোটবাবু তাঁবুর দরজাটা ফাঁক করিয়া বাদল ডাক্তারকে ডাকিলেন। পাশেই তাঁহার তাঁবু

ছোটবাবু। ওহে ডাক্তার!

নেপথ্যে বাদল। কি বলছেন?

ছোটবাবু। তোমার মোটর-বাইকটা নিয়ে একবার বেরুতে চাই।

নেপথ্যে বাদল। স্বচ্ছন্দে।

ছোটবাবু। তেল আছে তো?

নেপথ্যে বাদল। প্রচুর।

ছোটবাবু। কি করছ? মনে হচ্ছে যেন—

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, লিখছি।

ছোটবাবু। সেম থীম ?

নেপথ্যে বাদল। হ্যাঁ, মিক্স্‌ড উইথ মুন-লাইট।

ছোটবাবু। মুন-লাইট না মুন-শাইন ?

নেপথ্যে বাদল। দুইই।

ছোটবাবু। সাবাস! লেখ লেখ, বিরক্ত করব না তা হ'লে। এ কি, ঠানদি যে! আসুন আসুন।

ঠানদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পরনে চওড়া লাল আঁশ-পেড়ে একখানি ঢাকাই

ঠানদি। তোমার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন ?

ছোটবাবু। কই, না।

ঠানদি। কোথায় গেলেন তা হ'লে ?

ছোটবাবু। এ সময় আপনাকে ছেড়ে যাওয়া তো অন্যায়।

ঠানদি। দেখ তো ভাই।

ছোটবাবু। কতক্ষণ ধ'রে পাচ্ছেন না ?

ঠানদি। অনেকক্ষণ থেকে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো চিন্তার কথা। কলমিপুরের মাঠে ময়না নদীর ধারে ধারে পরীরা নাবে শুনেছি। কেউ উড়িয়ে-টুড়িয়ে নিয়ে গেল না তো!

ঠানদি। শুধু পরী নয়, কিন্নরও নাবে শুনেছি। তোমার পরীটি গেলেন কোথা, দেখতে পাচ্ছি না যে ?

ছোটবাবু। মায়ের তাঁবুতে গেছে।

ঠানদি। দেখো, উড়ে না যায়, তোমাদেরই ভয় বেশি। আমাদের বুড়ো হাবড়াকে কে আর পছন্দ করবে বল ? এখানে আসেন নি তা হ'লে ?

ছোটবাবু। না।

ঠানদি চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিলেন

ঠানদি। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, আমাদের তিনু চাটুজ্জে একটু আগে এসে ধরেছিল আমাকে, তার খাজনা নাকি স্থদে আসলে দাঁড়িয়েছে অনেক, তোমাকে ব'লে-ক'য়ে মাপ করিয়ে দিতে হবে।

ছোটবাবু। আপনি যদি হুকুম করেন, আমার সাধ্য আছে অমান্য করি?

ঠানদি। [হাসিয়া] হুকুম করব কেন ভাই, তোমাদের জমিদারি-ব্যাপারে আমাদের কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়। তবে তিনু চাটুজ্জে ছাপোষা মানুষ, প্রথম পক্ষেরই চারটি মেয়ে পাঁচটি ছেলে, তার ওপর দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল, আবার বিয়ে ক'রে মরেছে, এ বউটারও নাকি ছেলে হবে আসছে মাসে।

ছোটবাবু। তা হ'লে তো করিৎকর্ম্মা লোক।

ঠানদি। তোমরা সবাই এক জাতের, দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে।

ছোটবাবু। আপনার মুখে এ কথা সাজে না ঠানদি। ঠাকুরদার তো আপনিই ধ্যান-জ্ঞান।

ঠানদি। সব জানি গো, সব জানি। এখন তিনুকে কি বলব, বল?

ছোটবাবু। আপনি যখন ওর পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন মাপ করতেই হবে। ব'লে দোব আমি চৌধুরীকে।

ঠানদি। আহা, বড় উপকার হয় তা হ'লে ব্রাহ্মণের। এবার তা হ'লে যাই ভাই, দেখি, আমার কিন্নরটি কার পাল্লায় গিয়ে পড়লেন!

ঠানদি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর একটি জানালার পর্দ্দা একটু সরিয়া গেল এবং তাহার ফাঁক দিয়া ঠাকুরদা সন্তর্পণে বাহির হইতে মুণ্ড বাড়াইলেন

ছোটবাবু। [সবিস্ময়ে] এ কি, ঠাকুরদা যে!

ঠাকুরদা। [চুপিচুপি] তোমার ঠানদির গলার আওয়াজ পেলাম ব'লে মনে হ'ল !

ছোটবাবু। হ্যাঁ, তিনি আপনাকেই তো খুঁজছেন। ওখানে কি করছেন আপনি ?

ঠাকুরদা। তোমার তাঁবুর আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একটু নাচ দেখছি। ফাঁস ক'রে দিও না যেন। তোমাদের গোপন পরামর্শটিও শুনে ফেলেছি।

হাসিলেন

ছোটবাবু। ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন।

ঠাকুরদা। পাগল! ওই আবার কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

ঠাকুরদা মুণ্ড টানিয়া লইলেন। পাঞ্জাবি প্রভৃতি লইয়া তরঙ্গিণী প্রবেশ করিলেন

তরঙ্গিণী। ভারি একটা মজার জিনিস দেখে এলাম।

ছোটবাবু। [চুপিচুপি] যা বলবে, আস্তে বল। ঠিক পাশেই ঠাকুরদা আড়ি পেতে ব'সে আছেন।

তরঙ্গিণী। [নিম্নকণ্ঠে] তাই নাকি ? গিয়ে দেখি, জিতুর মা অঘোরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মা তাঁবুর জানলাটি খুলে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রয়েছেন আর মালা ঘোরাচ্ছেন। আমি গিয়ে সুটকেস খুলে এই সব বার করলাম, টেরও পেলেন না। পা টিপে টিপে কাছে গেলাম, কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না, একেবারে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন জ্যোৎস্নার দিকে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, যে মালাটা ঘোরাচ্ছেন, সেটা হরিনামের মালা নয়, একটা শুকনো ফুলের মালা।

ছোটবাবু। সে কি ?

তরঙ্গিণী। হ্যাঁ, টোকন আসবার সময় যে মালাটা প'রে এসেছিল সকালবেলায়, সেইটে বোধ হয় মায়ের তাঁবুতে ফেলে এসেছে। মা হরিনামের মালার বদলে সেইটে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন ব'সে ব'সে।

বাহিরে গোহুমনি গান গাহিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী এবং মাদলও শুরু হইয়া গেল

ছোটবাবু। এস, ওগুলো পরিয়ে দিই তোমায়।

তরঙ্গিণী। থাম, আগে একটু দেখি।

ছোটবাবু। ও জানলাটা খুলো না, ঠিক ওর তলাতেই ঠাকুরদা ব'সে আছেন।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরঙ্গিণী আর একটি জানালার পর্দা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিলেন

তরঙ্গিণী। কোমরে হাত দিয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচের কি বাহার মেয়ের—দেখ দেখ!

ছোটবাবুও উঠিয়া আসিয়া ফাঁক দিয়া উঁকি দিলেন

আ ম'ল, বিরিঞ্চিটাও এসে ওখানে বসেছে দেখছি যে! মুখ ফুলে তো ঢোল হয়েছে। ওমা, দেখ দেখ, গোহুমনি নাচতে নাচতে ওর থুতনিতে হাত দিয়ে দিয়ে আদর করছে! আচ্ছা, কি বেহায়া বাপু মেয়েটা!

ছোটবাবু। ওসব থাক্ এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল, তোমাকে ওগুলো আগে পরিয়ে দিই।

তরঙ্গিণী। ইস, তোমাকে পরাতে দোব বইকি, আমি নিজে পরব।

পর্দা সরাইয়া পাশের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ছোটবাবু মুচকি হাসিয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন। বাহিরে বাঁশী ও মাদল খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গোহুমনির গান স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল—

একা নাহি যাব যমুনায় লো—
যাইতে যমুনা-জলে
শ্রীরাধা সখীরে বলে
কদমতলায়
কালিয়া দাঁড়ায় লো,
একা নাহি যাব যমুনায় লো।

বাদল ডাক্তার। [নেপথ্য হইতে] আসতে পারি?

ছোটবাবু। এস এস।

পর্দ্দা ঠেলিয়া বাদল ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। গায়ে ধপধপে ফরসা একটি গেঞ্জি, বাঁ হাতের কব্জিতে একটি সাদা রুমাল বাঁধা, কাপড় ঢিলা ধরনে মালকোঁচা মারিয়া পরা। সর্ব্বদাই বাইকে চড়িতে হয় বলিয়া এই ভাবে তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন। পায়ে কাবুলী স্যাণ্ডাল। ভারী মুখখানাতে বুদ্ধিদীপ্ত স্মিত হাসি

বাদল। আপনি কি একাই বেরুবেন?

ছোটবাবু। না, ঠিক একা নয়।

বাদল। আর কে?

ছোটবাবু। আমার একটি গুজরাটী বন্ধু এসে হাজির হয়েছে কলকাতা থেকে। হিরণপুরে এসে আমাকে না পেয়ে একটা বাইক ক'রে এইখানেই এসে পড়েছে। তাকেই নিয়েই ঘুরব একটু।

বাদল। ও।

ছোটবাবু। কবিতা লেখা হয়ে গেল?

বাদল। [সহাস্যে] একটা সনেট হ'ল।

ছোটবাবু। সেই একই ধরনের ইংরেজী বাংলা মেশানো?

বাদল। হ্যাঁ।

ছোটবাবু। কই, দেখি।

বাদল। শুনবেন ?

ছোটবাবু। নিশ্চয়ই।

বাদল। নিয়ে আসি তা হ'লে।

বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পাশের ঘর হইতে পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী উঁকি দিলেন। চোখ-মুখ হইতে হাসি যেন উপচাইয়া পড়িতেছে

তরঙ্গিণী। গুজরাটী বন্ধু !

ছোটবাবু। তা ছাড়া আর উপায় কি ?

তরঙ্গিণী। আমি বুঝি গুজরাটীর মতন দেখতে ?

ছোটবাবু। চুপ চুপ, ডাক্তার আসছে।

তরঙ্গিণী পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। বাদল ডাক্তার কবিতা লইয়া প্রবেশ করিলেন

বাদল। মহা মুশকিলে পড়া গেছে !

ছোটবাবু। কি ?

বাদল। লাহিড়ীটা শ্যাম্পেন খেয়ে আমার বিছানায় এসে চিত হয়ে পড়েছে।

ছোটবাবু। থাক্ না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি এসে আমার তাঁবুটায় থাক ততক্ষণ।

বাদল। আপনার স্ত্রী ?

ছোটবাবু। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাকে মায়ের তাঁবুতে চালান ক'রে দিয়েছি।

বাদল। কি হ'ল তাঁর ?

ছোটবাবু। পেট ব্যথা করছে।

বাদল। তাই নাকি? ওষুধ দোব নাকি এক ডোজ্? আমার ব্যাগে ওষুধ আছে।

ছোটবাবু। থাক্, তার দরকার নেই। কবিতাটা পড়, শুনি।

বাদল ডাক্তার কাবুলী স্যাণ্ডেল সুদ্ধ বলিষ্ঠ একখানা পা টিনের চেয়ারের উপর রাখিয়া টেবিলে ভর দিয়া বসিলেন এবং একটু গলা-খাঁকারি দিয়া পড়িতে শুরু করিলেন

নির্জ্জন প্রান্তরে বসি তব রূপ হেরি নিনিমেষে,
কল্পনার কারাগারে করিয়াছি তোমারে বন্দিনী,
অলীক আলেয়া তুমি? মরীচিকাসম নাকি—they say,
যুগে যুগে মানবেরে ভুলিয়াছ হে ইভা-নন্দিনী?

Granted.—কিন্তু তুমি বন্দী মম মস্তিষ্কের খোপে,
যখন যতটা খুশি নেহারিব তোমার মাধুরী,
অনুভব করি যথা প্রতিদিন মোর Stethoscope-এ
পঞ্জর-পিঞ্জরে বন্দী হৃদয়ের চাপল্য চাতুরী।

হে বন্দিনী, তোল মুখ, খোল আঁখি, কথা বল বল,
ক্ষমা কর হই যদি অনিবার্য্য, ক্ষিপ্ত নিরঙ্কুশ;
সুনীল আকাশ-পাত্রে জ্যোৎস্না-বিষ করে টলমল,
তাহারই প্রভাবে সখি, হয়তো হয়েছি কিছু loose!

কিন্তু হায়, ক্ষোভ শুধু, যেই জ্যোৎস্না বিষবৎ to me,
হয়তো সে জ্যোৎস্নালোকে অতীব আনন্দে আছ তুমি।

বাদল ডাক্তর চুপ করিলেন। ছোটবাবুও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব রহিলেন। বাহিরে বাজিতে লাগিল—ঝমর ঝম, ঝমর ঝম, ঝমর ঝম

ছোটবাবু। চমৎকার হয়েছে!

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

বাদল। আমি তা হ'লে বাইকটা ঠিক করি গিয়ে ?

ছোটবাবু। হ্যাঁ।

বাদল ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পর্দা সরাইয়া তরঙ্গিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পাঞ্জাবি পরিয়াছেন, পাগড়িটা অর্দ্ধেক বাঁধা হইয়াছে, বাকি অর্দ্ধেকটা কাঁধ হইতে ঝুলিতেছে। কাপড়টাও ঠিকমত পরা হয় নাই

তরঙ্গিণী। ঠিক হচ্ছে না আমার, কাছা কোঁচা ঠিক করতে পারছি না।

ছোটবাবু। [হাসিয়া] বললাম, তুমি পারবে না। চল, ঠিক ক'রে দিই।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। অস্ফুটভাবে শোনা গেল, তরঙ্গিণী বলিতেছেন—আঃ, আঃ, ও কি হচ্ছে! বাহিরে গোহুম্নির নৃত্য উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

ময়না নদীর ওপারে জঙ্গলের একটি অংশ। সারি সারি তিনটি মাচা দেখা যাইতেছে, দুইটি খালি। তৃতীয়টিতে তালুকদার ও রোগা নিতাই বন্দুক হস্তে বসিয়া আছে। তালুকদার ঢুলিতেছে। অদূরে একটি প্রকাণ্ড শিমুলগাছের উপর বলিষ্ঠ হরু মণ্ডল বর্শা-হস্তে বসিয়া আছে। ভোর হইতেছে। দূরে বনানী-শীর্ষে চন্দ্র অস্তোন্মুখ। অস্তোন্মুখ চন্দ্রের কিরণ হরু মণ্ডলের বর্শাফলকে পড়িয়া চকচক করিতেছে

নিতাই। [তালুকদারকে ঠেলা দিয়া] ক্রমাগত ঢুলছ যে হে!

তালুকদার। [হাসিয়া] কি আর করি!

নিতাই। জামাইবাবু, হীরেনবাবু কেউ তো এল না হে!

তালুকদার। [হাই তুলিয়া] বাঘও তো এল না!

নিতাই। আশ্চর্য্য! অথচ মাঝরাত্রে বাঘের ডাকও শোনা গেল! শোন নি তুমি ?

তালুকদার। শুনেছি বইকি।

নিতাই। অথচ এল না কেন বল তো?

তালুকদার। কি জানি!

নিতাই। এদিকে ফরসাও তো হয়ে এল, শুকতারা উঠছে। সারারাত মশার কামড় ভোগ করাই সার হ'ল আমাদের।

তালুকদার। আমি কিন্তু ঢুলতে ঢুলতে বেশ মজার একটা স্বপ্ন দেখলাম। আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়, বলে না লোকে?

নিতাই। স্বপ্নটাই কি, শুনি না!

তালুকদার। স্বপ্ন দেখলাম, ছিপছিপে গড়নের একটা বাঘ ঠিক আমার মাচার সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেই বন্দুক তুলে গুলি করতে যাব, অমনই সে ফিক ক'রে হেসে বললে, চোখের মাথা খেয়েছ তুমি, দেখতে পাচ্ছ না, আমি যে লছমনিয়া। এ স্বপ্নের মানে কি ভাই?

নিতাই। [সবিস্ময়ে] নেশা-ভাঙ করেছ নাকি কিছু?

তালুকদার। আরে না না, নেশা-ভাঙ করতে যাব কেন?

নিতাই। [নীচের দিকে চাহিয়া] বিলটাও নেমে আসছে দেখছি।

বন্দুক ঘাড়ে বিলটা আসিয়া প্রবেশ করিল

তালুকদার। কি হে, তুমি নেবে এলে যে?

বিলটা। [সহাস্য মুখে] আপনারাও নাবুন।

তালুকদার। কেন?

বিলটা। আজ বাঘ আর আসবে না।

নিতাই। কি ক'রে জানলে তুমি?

বিলটা। বাঘিনী এসেছে যে একটা। বাঘ আর বাঘিনীটা চর পেরিয়ে চ'লে গেল দেখলাম দু-ই দিক পানে।

নিতাই। সে কি ?

বিলটা। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেবদারুগাছের মগডালে ব'সে সব দেখেছি আমি। প্রথমে এলে বাঘটা, নদীর চরের ওপর বসল, এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখলে খানিক, তারপর দিলে এক হাঁকাড়। শোনেন নি আপনারা ?

তালুকদার। শুনেছি বইকি। তারপর ?

বিলটা। তারপর এল-বাঘিনীটা। ইয়া লম্বা-চওড়া ঢুলঢুলে এক বাঘিনী! সেও এসে বসল বাঘটার কাছে, ব'সে তার গা চাটতে লাগল। বাঘটা ঘোরাতে লাগল তার ল্যাজটা পাক দিয়ে দিয়ে—সে এক কাণ্ড!

নিতাই। তারপর ?

বিলটা। তারপর দুজনে খানিক চাটাচাটি ক'রে উঠে পড়ল, চাঁদের আলোয় হেলতে দুলতে চ'লে গেল চর পেরিয়ে। নিজের চক্ষে দেখলাম।

তালুকদার। সত্যি ?

বিলটা। সত্যি নয় তো কি মিছে বলছি আমি ?

নিতাই। [সক্ষোভে] বাঘটা দেখলে তুমি, অথচ গুলি করলে না ?

বিলটা। কি বিপদ, আমার রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কি আমি ছেড়ে দিই ? তারা ছিল দু-ই চরের মাঝে, আমার নাগালের বাইরে।

নিতাই। আশ্চর্য্য কাণ্ড!

অস্তোন্মুখ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবিচলিত হরু মণ্ডল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল

যবনিকা